ফেলুদা সমগ্র

ছিন্নমস্তার অভিশাপ

সত্যজিৎ রায়

BENGALIEBOOK.COM 2021

সূচিপত্র

১. রামমোহন রায়ের নাতির সার্কাস ছিল 2
২. বেরিয়ে পড়লাম আমরা 11
৩. সার্কাসের বাঘ পালানো 20
৪. রাজরাপ্পা হাজারিবাগ থেকে আশি কিলোমিটার................ 30
৫. মহেশবাবুকে যখন বাড়িতে আনা হয় 44
৬. তিন মহাদেশের শক্তি............................ 50
৭. ফেলুদা এখন মহেশ চৌধুরীর ডায়রি নিয়ে বসবে 58
৮. ফেলুদার ঘরেই চা এনে দিল 65
৯. মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলের চিঠি 73
১০. চোর ডাকাতের উপদ্রব............................ 83
১১. কৈলাসে ফিরে এসে 91
১২. গাড়িতে অখিলবাবু বললেন 97

১. রামমোহন রায়ের নাতির সার্কাস ছিল

রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু চোখের সামনে থেকে বইটা সরিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, রামমোহন রায়ের নাতির সার্কাস ছিল সেটা জানতেন?

ফেলুদার মুখের উপর রুমাল চাপা, তাই সে শুধু মাথা নাড়িয়ে না জানিয়ে দিল।

প্রায় দশ মিনিট ধরে পর্বতপ্রমাণ খড়বোঝাই লরি আমাদের যে শুধু পাশ দিচ্ছে না। তা নয়, সমানে পিছন থেকে রেলগাড়ির মতো কালো ধোঁয়া ছেড়ে প্রাণ অতিষ্ঠা করে তুলেছে। লালমোহনবাবুর গাড়ির ড্রাইভার হরিপদবাবু বার বার হর্ন দিয়েও কোনও ফল হয়নি। লরির পিছনের ফুলের নকশা, নদীতে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য, হর্ন প্লিজ, টা-টা গুডবাই, থ্যাঙ্ক ইউ সব মুখস্থ হয়ে গেছে। লালমোহনবাবু সাকার্স সম্বন্ধে বইটা কিছুদিন হল জোগাড় করেছেন; অনেক দিন আগের লেখা বই, নাম বাঙালির সাকাস। বইটা ওঁর ঝোলার মধ্যে ছিল, লরির জ্বালায় সামনে কিছু দেখবার জো নেই বলে সেটা বার করে পড়তে শুরু করেছেন। ইচ্ছে আছে সার্কাস নিয়ে একটা রহস্য উপন্যাস লেখার তাই ফেলুদার পরামর্শ অনুযায়ী বিষয়টা নিয়ে একটু পড়াশুনা করে রাখছেন। সকাসের কথা অবিশ্যি এমনিতেই হচ্ছিল, কারণ আজ সকালেই রাঁচি শহরে দ্য গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের বিজ্ঞাপন দেখেছি। হাজারিবাগে এসেছে স্যাকস, আর আমরা যাচ্ছিও হাজারিবাগেই। ওখানে সন্ধেবেলা আর কিছু করার না থাকলে একদিন গিয়ে সার্কাস দেখে আসব সেটাও তিনজনে প্লান করে রেখেছি।

শীতের মুখটাতে কোথাও একটা যাবার ইচ্ছে ছিল; লালমোহনবাবুর নতুন বই পুজোয় বেরিয়েছে, তিন সপ্তাহে দু হাজার বিক্রি, ভদ্রলোকের মেজাজ খুশ,

হাত খালি। নতুন বইয়ের নাম ভ্যানকুভারের ভ্যামপায়ার-এ ফেলুদার আপত্তি ছিল; ও বলেছিল। ভানুকভার একটা পোল্লায় আধুনিক শহর, ওখানে ভ্যাম্পায়ার থাকতেই পারে না; তাতে লালমোহনবাবু বললেন হর্নিমানের জিওগ্রাফির বই তন্নতন্ন করে ঘেঁটে ওঁর মনে হয়েছে। ওটাই বেস্ট নাম! ফেলুদা কোডামযি় একটা তদন্ত করে এসেছে গত সেপ্টেম্বরে; মক্কেল সর্বেশ্বর সাহায়ের একটা বাড়ি আছে হাজারিবাগে, সেটা প্রায়ই খালি পড়ে থাকে, তাই ফেলুদার কাজে খুশি হয়ে ভদ্রলোক তাঁর বাড়িটা আফগার করেছেন দিন দশেকের জন্য। চৌকিদার আছে, সেই দেখাশুনা করে, আর তার বউ রান্না করে। খাওয়ার খরচ ছাড়া অন্ন কোনও খরচ লাগবে না আমাদের।

লালমোহনবাবুর নতুন অ্যাম্বাড়াসার্ডরেই যাওয়া ঠিক হল; বললেন, লং রানে গাড়িটা কীরকম সার্ভিস দেয় সেটা দেখা দরকার। গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আসানসোল-ধানবাদ হয়ে আসা যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খড়গপুর-রাঁচি হয়ে আসাই ঠিক হল। খড়গপুর পর্যন্ত ফেলুদা চালিয়েছে, তারপর থেকে ড্রাইভারই চালাচ্ছে। গতকাল সকাল আটটায় রওনা হয়ে খড়গপুরে লাঞ্চ সেরে সন্ধ্যায় রাঁচি পৌঁছই। সেখানে অ্যাম্বার হোটেলে থেকে আজ সকাল নটায় হাজারিবাগ রওনা দিই। পঞ্চাশ মাইল রাস্তা, খালি পেলে সোয়া ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়, কিন্তু এই লরির জ্বালায় সেটা নির্ঘাত দেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

আরও মিনিট পাঁচেক হর্ন দেবার পর লরিটা পাশ দিল, আর আমরাও সামনে খোলা পেয়ে হাঁপ ছাড়লাম। দু পাশে বাবলা গাছের সারি, তার অনেকগুলোতেই বাবুইয়ের বাসা, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথের ধারেও টিলা পড়ছে। লালমোহনবাবু বই বন্ধ করে দৃশ্য দেখে আহা-বাহা করছেন অন্ন মাঝে মাঝে বেমানান -রবীন্দ্র-সংগীত গুনগুন করছেন, যেমন অস্ত্রাণ মাসে ফাগুনের নবীন আনন্দে। ওঁর চেহারায় গান মানায় না, গলার কথা ছেড়ে দিলাম। মুশকিল হচ্ছে, উনি বলেন কলকাতার ডামাডোল থেকে বেরিয়ে নেচারের কনট্যাক্টে এলেই

নাকি ওঁর গান আসে, যদিও স্টক কম বুলে সব সময়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গান মনে আসে না।

তবে এটা বলতেই হবে যে ওঁর দৌলতে এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাকার্স সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে ফেলেছি। কে জানত আজ থেকে একশো বছর আগে বাঙালির সাকা্িস ভারতবর্ষে এত নাম কিনেছিল? সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল প্রোফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সাকিস। এই সাকর্মসে নাকি বাঙালি মেয়েরাও খেলা দেখাত, এমনকী বাঘের খেলাও। আর সেই সঙ্গে রাশিয়ান, আমেরিকান জামান আর ফরাসি খেলোয়াড়ও ছিল। গাস বার্নস বলে একজন আমেরিকানকে রেখেছিলেন। প্রোফেসর প্রিয়নাথ বোস বাঘ-সিংহ ট্রেনাড় করার জন্য। ১৯২০-এ প্রিয়নাথ বোস মারা যান। আর তারপর থেকেই বাঙালি সার্কাসের দিন ফুরিয়ে আসে।

এই গ্রেট ম্যাজেস্টিক কোন দেশি সার্কাস মশাই? জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

দক্ষিণ ভারতীয়ই হবে, বলল ফেলুদা, সাকাসটা আজকাল ওদের একচেটে হয়ে গেছে।

ভাল ট্র্যাপিজা আছে কি না সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। ছেলেবেলায় হামস্টোন আর কার্লেকার সাকর্ণসে যা ট্র্যাপিজ দেখিচি তা ভোলবার নয়।

লালমোহনবাবুর গল্পে নাকি ট্র্যাপিজের একটা বড় ভূমিকা থাকবে। শূন্যে সব লোমহর্ষক খেলার মাঝখানে একজন ট্র্যাপিজের খেলোয়াড় ঝুলন্ত অবস্থায় আরেকজনকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে খুন করবে; রহস্যের সমাধান করতে হিরো প্রখর রুদ্রকে নাকি ট্র্যাপিজের খেলা শিখতে হবে। ফেলুদা শুনে বলল, যাক, একটা জিনিস তা হলে আপনার হিরোর এখনও শিখতে বাকি।

৭২ কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই আর একটা অ্যাম্বাসাডর দেখা গেল! সেটা রাস্তার এক ধারে বনেট খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তার

পাশেই দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক হাত তুলে যে ভঙ্গিটা করছেন সেটা রেলের স্টেশনে খুব দেখা যায়। সেখানে সেটা গুড-বাই, আর এখানে হয়ে গেছে থামতে বলার সংকেত। হরিপদবাবু ব্রেক কষলেন।

ইয়ে, আপনারা হাজারিবাগ যাচ্ছেন কি?

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গায়ের রঙ ফরসা, চোখে চশমা, পরনে খয়েরি প্যান্টের উপর সাদা শার্ট আর সবুজ হাত-কটা পুলোভার। সঙ্গে ড্রাইভার আছে, যার শরীরের উপরের অর্ধেকটা এখন বনেটের নীচে।

প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা আজ্ঞে হ্যাঁ বলায় ভদ্রলোক বললেন, আমাদের গাড়িটা গণ্ডগোল করছে, বুঝেছেন। বোধহয় সিরিয়াস। তাই ভাবছিলাম...

আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে চাইলে আসতে পারেন।

সো কাইন্ড অফ ইউ! –ভদ্রলোক বোধহয় ভাবতে পারেননি যে না চাইতেই ফেলুদা অফারটা করবে।–আমি ওখান থেকে একটা মেকানিক নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে আসব। তা ছাড়া আর কোনও ইয়ে দেখছি না।

আপনার সঙ্গে লাগেজ কী?

একটা সুটকেস, তবে সেটা অবিশ্যি পরে নিয়ে যেতে পারি। এখান থেকে যেতে আসতে তিন কোয়ার্টারের বেশি লাগবে না।

চলে আসুন।

ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠে আরও দু বার বললেন সো কাইন্ড অফ ইউ। তারপর বাকি পথটা আমরা কিছু না জিজ্ঞেস করতেই নিজের বিষয়ে একগাদা বলে গেলেন। ওঁর নাম প্রীতীন্দ্র চৌধুরী। বাপ

বছর দশেক হল রিটায়ার করে হাজারিবাগে বাড়ি করে আছেন, আগে রাঁচিতে অ্যাডভোকেট ছিলেন, নাম মহেশ চৌধুরী। এ অঞ্চলের নামকরা লোক।

আপনি কলকাতাতেই থাকেন? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

হ্যাঁ। আমি ইলেকট্রনিকসে। ইন্ডোভিশনের নাম শুনেছেন?

ইন্ডোভিশন নামে একটা নতুন টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন কিছুদিন থেকে কাগজে দেখছি, সেটা নাকি এঁদেরই তৈরি।

আমার বাবার সত্তর পূর্ণ হচ্ছে কাল, বললেন ভদ্রলোক, বড়দা আমার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে দিন তিনেক হল পৌঁছে গেছেন। আমার আবার দিল্লিতে একটা কাজ পড়ে গোসল, আসা মুশকিল হচ্ছিল, কিন্তু বাবা টেলিগ্রাম করলেন মাস্ট কাম বলে। —একটু থামাবেন গাড়িটা কাইন্ডলি?

গাড়ি থামল; কেন তা বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক তাঁর হাতের ব্যাগটা থেকে একটা ছোট্ট ক্যাসেট রেকড়ার বার করে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশেই একটা শালবনে ঢুকে মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, একটা ফ্লাইক্যাচার ডাকছিল; লাকিলি পেয়ে গেলাম। পাখির ডাক রেকর্ড করাটা আমার একটা নেশা। সে কাইন্ড অফ ইউ।

ধন্যবাদটা অবিশ্যি তাঁর অনুরোধে গাড়ি থামানোর জন্য।

আশ্চর্য্য, ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে এত বলে গেলেও, আমাদের কোনও পরিচয় জানতে চাইলেন না। ফেলুদা অবিশ্যি বলে যে একেকজন লোক থাকে যারা অন্যের পরিচয় নেওয়ার চেয়ে নিজের পরিচয় দিতে অনেক বেশি ব্যগ্র।

হাজারিবাগ টাউনে পৌঁছে ইউরেকা অটামোবিলস্-এ প্রীতীন্দ্রবাবুকে নামিয়ে দেবার পর আর একবার সো কাইন্ড অফ ইউ বলে ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, ভাল কথা, আপনারা উঠিছেন কোথায়?

জবাবটা দিতে ফেলুদার গলা তুলতে হল, কারণ গাড়ির কাছেই কেন জানি লোকের ভিড় জমেছে, আর সবাই বেশ উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে। কী বিষয়ে কথা হচ্ছে সেটা অবিশ্যি পরে জেনেছিলাম।

ফেলুদা বলল, সঠিক নির্দেশ দিতে পারব না, কারণ এই প্রথম আসছি এখানে। এটা বলতে পারি। যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউস আর কর্নেল মোহান্তির বাড়ির খুব কাছে।

ও, তার মানে আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট সাতেকের হাঁটা পথ। –টেলিফোন আছে?

সেভেন ফোর টু।

বেশ, বেশ।

আর আমার নাম মিত্র। পি সি মিত্র।

দেখেছেন, নামটাই জানা হয়নি!

ভদ্রলোককে ছেড়ে দিয়ে রওনা হবার পর ফেলুদা বলল, নতুন মাল বাজারে ছাড়ছে বলে বোধহয় টেনিস হয়ে আছে।

বাতিকগ্রস্ত, বললেন লালমোহনবাবু।

ডিস্ট্রিক্ট বার্ড রেস্ট হাউসের কথা জিজ্ঞেস করে আমাদের বাড়ির রাস্তা খুঁজে বার করতে কোনও অসুবিধা হল না। কর্নেল জি সি মোহান্তির নাম লেখা মার্বেল

ফলক-ওয়ালা গেট ছাড়িয়ে তিনটে বাড়ি পরেই এস সহায় লেখা বুগেনভিলিয়ায় ঢাকা গেটের বাইরে এসে হর্ন দিতেই একজন বেঁটে মাঝবয়সী লোক এসে গেটটা খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকলি। মোরাম ঢাকা পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একতলা বাংলো টাইপের বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি থামল। মাঝবয়সী লোকটাও দৌড়ে এসেছে। পিছন পিছন, জিজ্ঞেস করে জানলাম সে-ই চৌকিদার, নাম বুলাকিপ্রসাদ।

গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম কী নির্জন। বাংলোটা ঘিরে বেশ বড় কম্পাউন্ড (লালমোহনবাবু বললেন অ্যাি্ট লিস্ট তিন বিঘে), একদিকে বাগানে তিন চার রকম ফুল ফুটে আছে, অন্য দিকে অনেকগুলো বড় বড় গাছ, তার মধ্যে তেঁতুল, আমি আর অর্জন চিনতে পারলাম। কম্পাউন্ডের পাঁচিলের উপর দিয়ে উত্তর দিকে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সেটাই নাকি কানারি হিল, এখানে থেকে মাইল দুয়েক।

বাড়িটা তিনজনের পক্ষে একেবারে ফরমাশ দিয়ে তৈরি। সামনে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে চওড়া ধারান্দার পর পাশাপাশি তিনটে ঘর। মাঝেরটা বৈঠকখানা, আর দুদিকে দুটো শোবার ঘর। পিছন দিকে আছে খাবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। সানসেট দেখা যাবে বলে লালমোহনবাবু পশ্চিমের বেডরুমটা নিলেন।

সুটকেস থেকে জিনিস বার করে বাইরে রাখছি, এমন সময় বুলকিপ্রসাদ আমার ঘরে চা নিয়ে এসে ট্রেটা টেবিলের উপর রেখে যে কথাটা বলল, তাতে আমাদের দুজনেরই কাজ বন্ধ করে ওর দিকে চাইতে হল। লালমোহনবাবু সবে ঘরে ঢুকেছেন, তিনিও দরজার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে গেলেন।

আপলোগ যব বাহার যাঁয়ে, বলল বুলাকিপ্রসাদ পয়দল যানেসে যারা সমহালকে যান।

চোর ডাকাতের কথা বলছে নাকি মশাই? বললেন লালমোহনবাবু।

নেহি, বাবু; বাঘ ভাগ গিয়া মজিস্টি সর্কস সে।

সর্বনাশ! লোকটা বলে কী!

জিজ্ঞেস করতে জানা গেল। আজই সকলে নাকি একটা তাগড়াই বাঘ সার্কাসের খাঁচা থেকে পালিয়েছে। কী করে পালিয়েছে সেটা বুলকিপ্রসাদ জানে না, কিন্তু সেই বাঘের ভয়ে সারা হাজারিবাগ শহর তটস্থ। বাঘের খেলাই নাকি এক সার্কাসের যাকে বলে স্টার অ্যাট্রাকশন। সার্কাসের বিজ্ঞাপনাও যা দেখেছি, তাতে বাঘের ছবিটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। ফেলুদার অবিশ্যি চোখই আলাদা, তাই সে আমাদের চেয়ে বেশি দেখেছে। বলল, বাঘের খেলা যিনি দেখান। তিনি নাকি মারাঠি, নাম কারান্ডিকার, আর নামটা নাকি বিজ্ঞাপনে দেওয়া ছিল।

লালমোহনবাবু খবরটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন তার গল্পে বাঘ পালানোর ঘটনা একটা রাখা যায় কি না সেটা তিনি ভাবছিলেন, কাজেই এটাকে টেলিপ্যাথি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। –তবে আপনি মশাই একেবারে ইন্‌কঙ্গিটো হয়ে থাকুন, গোয়েন্দা জানলে আপনাকে নিঘাত ওই বাঘ সন্ধানের কাজে লাগিয়ে দেবে।

ইনকাঙ্গিটা অবিশ্যি ইনকগনিটের জটায়ু সংস্করণ। লালমোহনবাবু মাঝে মাঝে ইংরিজি কথায় এরকম ওলট পালট করে ফেলেন। খবরটা শুনে এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তাঁকে আর শুধরে দেওয়া হল না। ফেলুদা অবিশ্যি অকারণে কখনও ওর পেশাািটা প্রকাশ করে না। আর গোয়েন্দা বলেই যে ওকে যে কেউ যে কোনও তদন্তে ফাঁসিয়ে দেবে। সেটারও কোনও সম্ভাবনা নেই।

বুলাকিপ্রসাদ আরও বলল যে সাকাসটা নাকি আগে শহরের মাঝখানে কার্জন মাঠে বসন্ত, এইবারই নাকি প্রথম সেটা শহরের এক ধারে একটা নতুন জায়গায়

বসেছে; এই মাঠটা‍ির উত্তরে নাকি বিশেষ বসতি নেই। বাঘ যদি সেদিক দিয়ে বেরোয় তা হলে রাস্তা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই জঙ্গল পাবে। কাছাকাছি আদিবাসীদের গ্রাম আছে, খিদে পেলে সেখান থেকে গোরু বাছুর টেনে নিয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

মোটকথা, ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর। আপশোস এই যে হাজারিবাগের মতো জায়গায় এসে বাঘের ভয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ানো যাবে না।

চা খাওয়ার পর লালমোহনবাবু প্রস্তাব করলেন যে দুপুরে একবার গ্রেট ম্যাজেস্টিকে ঢুঁ মারা হাক। ঘটনাটা ঠিক কী ভাবে ঘটেছে সেটা জানতে পারলে নাকি ওঁর খুব কাজে দেবে। ঢুঁ মারা মানে কি টিকিট কেটে সার্কাস দেখার কথা ভাবছেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ঠিক তা নয়, বললেন লালমোহনবাবু, আমি ভাবছিলাম। যদি খোদ মালিকের সঙ্গে দেখা করা যায়। অনেক ডিটেলস জানা যেত ওঁর কাছে।

সেটা ফেলুমিত্তিরের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

২. বেরিয়ে পড়লাম আমরা

বেরিয়ে পড়লাম আমরা। বুঝতে পারলাম ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতূহল আছে। এই বাঘ পালানোর ব্যাপারে। বেক্লোবার আগে থানায় একটা ফোন করল। কোডামযি ওকে বিহার পুলিশের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল, সর্বেশ্বর সহায়কেও এখানে সবাই চেনে, তাই নাম করতেই ইনস্পেক্টর রাউত ফেলুদাকে চিনে ফেললেন। আসলে পুলিশের সাহায্য ছাড়া হয়তো এই জরুরি অবস্থায় সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করা মুশকিল হত। রাউত বললেন, সার্কাসের সামনে পুলিশের লোক থাকবে, ফেলুদার কোনও অসুবিধা হবে না। ফেলুদা এটাও বলে দিল যে সে কোনওরকম তদন্ত করতে যাচ্ছে না, কেবল কৌতূহল মেটাতে যাচ্ছে।

সমস্ত শহরে যে সাড়া পড়ে গেছে সেটা গাড়িতে যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছিলাম। শুধু যে রাস্তার মোড়ে জটিল তা নয়, একটা চৌমাথায় দেখলাম ঢাি়ড়া পিটিয়ে লোকদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। ফেলুদা একটা পানের দোকানো চারমিনার। কিনতে নেমেছিল, সেখানে দোকানদার বলল যে বাঘটাকে নাকি উত্তরে ডাহিরি বলে একটা আদিবাসী গ্রামের কাছাকাছি দেখা গেছে, তবে কোনও উৎপাতের কথা এখনও শোনা যায়নি।

সাকসের তাঁবু দেখলেই বুকের ভিতরটা কেমন জানি করে ওঠে, ছেলেবেলা ফেলুদার সঙ্গে কত সার্কাস দেখেছি সে কথা মনে পড়ে যায়। গ্রেট ম্যাজেস্টিকের সাদা আর নীল ডোরাকাটা ছিমছাম। তাঁবুটা দেখলেই বোঝা যায় এটা জাত সাকাস। তাঁবুর চূড়োয় ফরফর করে হলদে ফ্ল্যাগ উড়ছে, চুড়ো থেকে বেড়া অবধি টেনে আনা দড়িতে আরও অজস্র রঙিন ফ্ল্যাগ। তাঁবুর গেটের বাইরে কমপক্ষে হাজার লোক, তারা অনেকেই টিকিট কিনতে এসেছে। বাঘ পালানোয় সার্কাস বন্ধ হয়নি, শুধু আপাতত বাঘের খেলাটাই স্থগিত। আরও কতরকম খেলা

যে সে সাকাসে দেখানো হয় সেটা হাতে আঁকা প্রকাণ্ড বড় বড় বিজ্ঞাপনে বোঝানো হয়েছে। শিল্পী খুব পাকা নন, তবে লোকের মনে চনমনে ভাব আনতে এই যথেষ্ট।

পুলিশের লোক গেটের বাইরেই ছিল। ফেলুদা কার্ডটা দিতেই খুব খাতির করে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। বলল, মালিক মিঃ কুট্টিকেও বলা আছে, তিনি তাঁর ঘরে অপেক্ষা করছেন।

তাঁবুটাকে ঘিরে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে তারপর টিনের বেড়া। এই বেড়ার মধ্যেই একধারে দাঁড়িয়ে আছে দ্য গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের মালিক মিঃ কুট্টির ক্যারাভ্যান। বলা যায় একটা সুদৃশ্য চলন্ত বাড়ি। দুপাশের সার বাঁধা কাচের জানালায় নকশা করা পদার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো রোদ ঢুকেছে। ভিতরে আবছা অন্ধকারে। মিঃ কুট্টি চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাদের তিনজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বসবার জন্য মিনি-সোফা দেখিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের গায়ের রং মাজা, বয়স পঞ্চাশের বেশি না হলেও মাথার চুল ধপধাপে সাদা, হাসলে বোঝা যায় দাঁতও চুলের সঙ্গে মানানসই, যদিও ফলস টিথ নয়।

ফেলুদা প্রথমেই বলে নিল যে ও পুলিশের লোক নয়, সার্কাস ওর খুব প্রিয় জিনিস, গ্রেট ম্যাজেস্টিকের খ্যাতির কথা ও জানে, হাজারিবাগে এসে সাকর্গস দেখার ইচ্ছে ছিল, আপশোঁস এই যে একটা দুর্ঘটনার জন্য আসল খেলাটাই দেখা হবে না। সেই সঙ্গে লালমোহনবাবুরও পরিচয় করিয়ে দিল। একজন বিশিষ্ট লেখক বলে। –সার্কাস নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা ভাবছেন মিঃ গাঙ্গুলী।

মিঃ কুট্টি বললেন, সাকসে আসার আগে ছবছর উনি কলকাতায় একটা জাহাজ কোম্পানিতে ছিলেন, বাঙালিদের ভালবাসেন, কারণ বাঙালিরাই নাকি সাকসের সত্যিকার কদর করে। আমরা সার্কাস দেখায় নিরুৎসাহ বোধ করছি জেনে বললেন যে বাঘের খেলা ছাড়াও অনেক কিছু দেখার আছে গ্রেট ম্যাজেস্টিকে।

–কাল আমাদের স্পেশাল, শো ছিল, হাজারিবাগের অনেক নামকরা লোককে আমরা ইনভাইট করেছিলাম। আপনাদেরও ইনভাইট করছি।

ব্যাপারটা হল কী ভাবে? লালমোহনবাবু হিন্দি আর ইংরিজি মিশিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। (আসলে জিজ্ঞেস করেছিলেন–শের তো ভাগা, বাট হাউ?)

ভেরি আনফরচুনেট, মিঃ গাঙ্গুলী, বললেন মিঃ কুট্টি। বাঘের খাঁচার দরজাটা ঠিক ভাবে বন্ধ করা হয়নি। বাঘ নিজেই সেটাকে মাথা দিয়ে ঠেলে তুলে পালিয়েছে। তার উপর আর একটা গলতি হয়েছে। এই যে টিনের বেড়ার একটা অংশ কে জানি ফাঁক করে বাইরে যাবে। বলে শর্টকাট করেছিল তারপর আর বন্ধ করেনি। কে দাষী সেটা আমরা বার করেছি, আর তার জন্য প্রপার স্টেপস নিচ্ছি।

ফেলুদা বলল, বম্বেতে একবার ঠিক এইভাবে বাঘ পালিয়েছিল না?

হ্যাঁ, ন্যাশনাল সার্কাস। শহরের রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল বাঘ। কিন্তু বেশি দূর যাবার আগেই রিং-মাস্টার তাকে ধরে নিয়েছিল।

এখানকার বাঘ পালানোর ব্যাপারে আরও খবর জানলাম কুট্টির কাছে। কম করে জনা পঞ্চাশেক লোক নাকি বাঘটাকে তাঁবুর বাইরে দেখেছে। এক পেট্রোল স্টেশনের মালিকের বাড়ির উঠোনে নাকি বাঘটা ঢুকেছিল। ভদ্রলোকের স্ত্রী সেটাকে দেখতে পেয়ে ভিরমি যান। এক নেপালি ভদ্রলোক স্কুটারে যাচ্ছিলেন, তিনি বাঘটাকে রাস্তা পেরোতে দেখে সোজা ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরে পাঁজরার তিনটে হাড় ভেঙে এখন হাসপাতালে আছেন।

আচ্ছা, আপনাদের তো রিং-মাস্টার আছে নিশ্চয়ই?

রিং-মাস্টার কথাটা নতুন শিখে সেটা ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারলেন না জটায়ু।

কে, কারাভিকার? তার শরীর কিছুদিন থেকে এমনিতেই খারাপ যাচ্ছে। বয়স হয়েছে নিয়ারলি ফর্টি। ঘাড়ে একটা ব্যথা হয় মাঝে মাঝে, তাই নিয়েই খেলা দেখায়। আমার কথা শুনবে না, ডাক্তার দেখাবে না। মাস খানেক হল তাই আমি আর একজন লোক রেখেছি। নাম চন্দ্রন। কেরলের লোক! ভেরি গুড। সেও বাঘ ট্রেন করে, কারাভিকার অসুস্থ হলে সে-ই খেলা দেখায়।

কাল স্পেশাল শো-তে দেখিয়েছিল? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

কাল কারাভিকারই দেখিয়েছিল। একটা খেলা ও ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারে না। খেলার ক্লাইম্যাক্সে দুহাতে বাঘের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেয়। দুঃখের বিষয়, কাল একটা বিশ্রী গণ্ডগোল হয়ে যায়। দুবার চেষ্টা করেও যখন বাঘ মুখ খুলল না, তখন কারাভিকার হঠাৎ চেষ্টা থামিয়ে দিয়ে খেলা শেষ করে দেয়। ফলে হাততালির সঙ্গে তাকে কিছু টিটকিরিও শুনতে হয়েছিল।

আপনি তাতে কোনও স্টেপ নেননি?

নিয়েছি বইকী। পুরনো লোক, কিন্তু তাও কথা শোনাতে হল। ও সতেরো বছর কাজ করছে সাকাসে। প্রথম তিন বছর গোলেডনে ছিল, বাকি সময়টা এখানে। ওর যা নাম তা আমার সাকাসে খেলা দেখিয়েই! এখন বলছে কাজ ছেড়ে দেবে। খুবই দুঃখের কথা, কারণ অন্তত আরও বছর তিনেক ও কাজ করতে পারত বলে আমার বিশ্বাস।

বাঘ খুঁজতে সার্কাসের লোক যায়নি?

কারান্ডিকারেরই যাবার কথা ছিল, কিন্তু ও রাজি হয়নি। তাই চন্দ্রনকে যেতে হয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকের সঙ্গে!

লালমোহনবাবুর সাহস বেড়ে গেছে। বললেন, কারান্ডিকারের সঙ্গে দেখা করা যায়? কোনও গ্যারান্টি দিতে পারি না, বললেন মিঃ কুট্টি, খুব মুডি লোক। মুরুগোশের সঙ্গে যান আপনারা গিয়ে দেখুন। সে দেখা করে কি না।

মুরুগোশ হল মিঃ কুট্টির পাসোনাল বেয়ারা। সে বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, মন্নিবের হুকুমে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেল রিং-মাস্টারের তাঁবুতে।

তাঁবুর ভিতরে দুটো ভাগ; একটা বসার জায়গা, আর একটা শোবার। আশ্চর্য এই যে খবর দিতেই বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন রিং-মাস্টার। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে বলে দিতে হয় না যে উনি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ, বাঘের খেলা দেখানোর পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত চেহারা আর হয় না। লম্বায় ফেলুদার সমান, চওড়ায় ওর দেড়া। ফরসা রঙে কুচকুচে কালো চাড়া-দেওয়া গোঁফটা আশ্চর্য খুলেছে, চোখের দৃষ্টি এখন উদাস হলেও হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কথা বলতে জ্বলে ওঠে। ভদ্রলোক জানিয়ে দিলেন যে তিনি মারাঠি মালয়ালম তামিল আর ভাঙা ভাঙা ইংরিজি আর হিন্দি জানেন। শেষের দুটো ভাষাতেই কথা হল।

কারান্ডিকার প্রথমেই জানতে চাইলেন আমরা কোনও খবরের কাগজ থেকে আসছি কি না। বুঝলাম ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর হাতে খাতা পেনসিল দেখেই প্রশ্নটা করেছেন। ফেলুদা প্রশ্নের জবাবটা যেন বেশ হিসেব করে দিল।

যদি তাই হয়, তা হলে আপনার কোনও আপত্তি আছে?

আপত্তি তো নেইই, বরং সেটা হলে খুশিই হব। এটা পাবলিকের জানা দরকার যে বাঘ পালানোর জন্য ট্রেনার কারান্ডিকার দায়ী নয়, দায়ী সার্কাসের মালিক।

বাঘ দুজন ট্রেনারকে মানে না, একজনকেই মানে। অন্য ট্রেনার আঁসার পর থেকেই সুলতানের মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছিল। আমি সেটা মিঃ কুট্টিকে বলেছিলাম, উনি গা করেননি। এখন তার ফল ভোগ করছেন।

আপনি বাঘটাকে খুঁজতে গেলেন না যে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ওরাই খুঁজুক না, গভীর অভিমানের সঙ্গে বললেন কারান্ডিকার।

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে ফেলুদাকে বাংলায় বললেন, একটু জিজ্ঞেস করুন তো তেমন তেমন দরকার পড়লে উনি যাবেন কি না। খবরটা পেলে বাঘ ধরা দেখা যেত। অবিশ্যি একা নয়, ইন ইওর কম্পানি। খুব থ্রিলিং ব্যাপার হবে নিশ্চয়ই।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করাতে কারান্ডিকার বললেন যে বাঘকে গুলি করে মারার প্রস্তাব উঠলে তাঁকে যেতেই হবে বাধা দিতে, কারণ সুলতান ওঁর আত্মীয়ের বাড়া!

আমিও একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার কথা ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত ফেলুদাই করল।

আপনার মুখে কি বাঘ কোনওদিন আঁচড় মেরেছিল?

নট সুলতান, বললেন কারান্ডিকার। গোল্ডেন সার্কাসের বাঘ। গাল আর নাকের খানিকটা মাংস তুলে নিয়েছিল।

কথাটা বলে কারান্ডিকার তাঁর শর্ট খুলে ফেললেন। দেখলাম বুকে পিঠে কাঁধে কত যে আঁচড়ের দাগ রয়েছে তার হিসেব নেই।

আমরা ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম। তাঁবু থেকে বেরোবার সময় ফেলুদা বলল, আপনি এখন এখানেই থাকবেন?

কারান্ডিকার গভীর হয়ে বললেন আজি সতেরো বছর আমি সকাসের তাঁবুকেই ঘর বলে জেনেছি। এবার বোধহয় নতুন ডেরা দেখতে হবে।

লালমোহনবাবু মিঃ কুট্টিকে বলে রেখেছিলেন যে তিনি ম্যাজেস্টিকের পশুশালাটা একবার দেখতে চান। মুরুগশের সঙ্গে গিয়ে আমরা সাকসের অবশিষ্ট দুটি বাঘ, একটা বেশ বড় ভাল্লুক, একটা জলহস্তী, তিনটে হাতি, গোটা ছয়েক ঘোড়া আর সুলতানের গা ছমছম করা খালি খাঁচটা দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল পাঁচটা। বুলাকিপ্রসাদকে চা দেবার জন্য ডেকে পাঠাতে সে বলল, চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে একজন বাবু এসেছিলেন, বলে গেছেন আবার আসবেন।

সাড়ে ছটায় এলেন প্রীতীন্দ্র চৌধুরী। ইতিমধ্যে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাপ্ করে ঠাণ্ডা পড়েছে, আমরা সবাই কোিট পুলোভার চাপিয়ে নিয়েছি, লালমোহনবাবুর মাঙ্কিক্যাপটা পরার মতো ঠাণ্ডা এখনও পড়েনি, কিন্তু ওঁর টাক বলে উনি রিস্ক না নিয়ে এর মধ্যেই ওটা চাপিয়ে বসে আছেন।

আপনি যে ডিটেকটিভ সেটা তো বলেননি! আমাদের তিনজনকেই অবাক করে দিয়ে বললেন প্রীতীন্দ্র চৌধুরী। -বাবা তো আপনার মক্কেল মিঃ সহায়কে খুব ভাল করে। চেনেন। সহায় ওঁকে জানিয়েছেন যে আপনারা এখানে আসছেন। বুঝাবা বিশেষ করে বলে। দিয়েছেন। আপনারা তিনজনেই যেন কাল আমাদের সঙ্গে পিকনিকে আসেন।

পিকনিক? লালমোহনবাবু ভুরু কপালে তুলে প্রশ্ন করলেন।

বলেছিলাম না-কাল বাবার জন্মদিন। আমরা সবাই যাচ্ছি। রাজরা প্লা পিকনিক করতে। দুপুরে ওখানেই খাওয়া। আপনাদের তো গাড়ি রয়েছে, নটা নাগাত আমাদের ওখানে চলে আসুন। বাড়ির নাম কৈলাস। আপনাদের ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি, খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা হবে না।

রাজরাপ্পা হাজারিবাগ থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূর, জলপ্রপাত আছে, চমৎকার দৃশ্য, আর একটা পুরনো কালীমন্দির আছে—নাম ছিন্নমস্তার মন্দির। এসব আমরা আসবার আগেই জেনে এসেছি, আর পিকনিকের নেমন্তন্ন না হলো নিজেরাই যেতাম।

প্রীতীনবাবু আরও বললেন যে আমরা যদি একটু আগে আগে যাই, তা হলে মহেশবাবুর প্রজাপতি আর পাথরের কালেকশনটাও দেখা হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু পিকনিকে যে যাচ্ছেন আপনারা, বাঘ পালানোর খবরটা জানেন কি? ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

জানি বইকী। হেসে বললেন প্রীতীনবাবু, কিন্তু তার জন্য ভয় কী? সঙ্গে বন্দুক থাকবে। আমার বড়দা ক্র্যাক শট। তা ছাড়া বাঘ তো শুনেছি উত্তরে হানা দিচ্ছে, রাজরাপ্পা তো দক্ষিণে, রামগড়ের দিকে। কোনও ভয় নেই।

ঠিক হল আমরা সাড়ে আটটা নাগাত মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছে যাব। লালমোহনবাবু, কৈলাস নাম দিল কেন, মশাই-এর উত্তরে ফেলুদা বলল, শিবের বাসস্থান কৈলাস, আর মহেশ শিবের নাম, তাই কৈলাস।

প্রীতীনবাবু চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে এল। আমরা বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বাতিটা জ্বাললাম না, যাতে চাঁদের আলো উপভোগ করা যায়। ছিন্নমস্তার মন্দিরের কথাটা লালমোহনবাবু জানতেন না, তাই বোধহয় মাঝে মাঝে নামটা বিড়বিড় করছিলেন। সাতবারের বার ছিন বলেই থেমে যেতে হল, কারণ ফেলুদা হাত তুলেছে।

আমরা তিনজনেই চুপ, ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, এমন সময় শোনা গেল।–বেশ দূর থেকে, তাও গায়ের রক্ত জল করা-বাঘের গর্জন। একবার, দুবার, তিনবার।

সুলতান ডাকছে।

কোনদিক থেকে, কতদূর থেকে, সেটা বুঝতে হলে শিকারির কান চাই।

৩. সার্কাসের বাঘ পালানো

আমি ভেবেছিলাম যে সার্কাসের বাঘ পালানোটাই বুঝি হাজারিবাগের আসল ঘটনা হবে; কিন্তু তা ছাড়াও যে আরও কিছু ঘটবে, আর ফেলুদা যে সেই ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়বে, সেটা কে জানত? ২৩শে নভেম্বর মহেশ চৌধুরীর বার্থডে পিকনিকের কথাটা অনেক' দিন মনে থাকবে, আর সেই সঙ্গে মনে থাকবে রাজরাপ্পীর আশ্চর্য সুন্দর রুক্ষ পরিবেশে ছিন্নমস্তার মন্দির।

কাল রাত্রে বাঘের ডাক শোনার পথ থেকেই লালমোহনবাবুর মুখটা জানি কেমন হয়ে গিয়েছিল, ভাবছিলাম বলি উনি আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে শোন, আর ফেলুদা পশ্চিমের ঘরটা নিক, কিন্তু সেদিকে আবার ভদ্রলোকের গোঁ আছে। চৌকিদারের কাছে টাঙি আছে। জেনে, আর লোকটা বেঁটে হলেও সাহসী জেনে ভদ্রলোক খানিকটা আশ্বাস পেয়ে নিজের তিন সেলের টর্চের বদলে আমাদের পাঁচ সেলটা নিয়ে দশটা নাগাত নিজের ঘরে চলে গেলেন। বড় টর্চ নেওয়ার কারণ এই যে, ফেলুদা বলেছে। তীব্র আলো চোখে ফেললে বাঘ নাকি অনেক সময় আপনা থেকেই সয়ে পড়ে। –অবিশ্যি জানালার বাইরে যদি গর্জন শোনেন, তখন টর্চ জ্বালানোর কথা, আর সেই টর্চ জানালার বাইরে বাঘের চোখে ফেলার কথা, মনে থাকবে কি না সেটা জানি না।

যাই হাক, রাত্রে বাঘ এসে থাকলেও সে গর্জন করেনি, তাই টর্চ ফেলারও কোনও দরকার হয়নি।

আমরা প্রীতীনবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক সাড়ে আটটার সময় কৈলাসের লাল ফটকের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে লালমোহনবাবু

মন্তব্য করলেন যে বোঝাই যাচ্ছে। এ শিব হল সাহেব শিব। সত্যিই, বছর দশেক আগে তৈরি হলেও বাড়ির চেহারাটা সেই পঞ্চাশ বছর আগের ব্রিটিশ আমলের বাড়ির মতো।

দারোয়ান গেট খুলে দিতে আমরা গাড়িটা বাইরে রেখে কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। আরও তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কম্পাউন্ডের এক পাশে একটা কালকের দেখা প্রীতীনবাবুর কালো অ্যামবাসাডর, একটা সাদা ফিয়াট, আর একটা পুরনো হলদে পানটিয়াক।

একটা কু পাওয়া গেছে মশাই।

লালমোহনবাবু বাগান আর রাস্তার মাঝখানে সাদা রং করা ইটের বেড়ার পাশ থেকে একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা বলল, আপনি রহস্যের অবর্তমানেই কু-য়ের সন্ধান পাচ্ছেন?

জিনিসটা কীরকম মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে না?

একটা রুলটানা খাতার পাতা, তাতে সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কিছু, অর্থহীন ইংরিজি কথা। মিস্ট্রির কিছুই নেই; বাঝাই যাচ্ছে সেটা বাচ্চার হাতের লেখা, আর সেই কারণেই কথাগুলোর কোনও মানে নেই। যেমন-OKAHA, RKAHA, LOKC

ওকাহা যে জাপানি নাম সে তো বোঝাই যাচ্ছে বললেন লালমোহনবাবু।

বাংলা নামটা না চিনে জাপানি নামটা চিনে ফেললেন?—বলে ফেলুদা কাগজটা পকেটে পুরে নিল।

একজন ভীষণ বুড়ো মুসলমান বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল গাড়িবারান্দার নীচে, সে আমাদের সেলাম করে আইয়ে বলে ভিতরে নিয়ে গেল। একটা চেনা গলা আগে

থেকেই পাচ্ছিলাম, বৈঠকখানার চৌকাঠ পেরোতেই প্রীতীনবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

আসুন, আসুন—সো কাইন্ড অফ ইউ টু কাম।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখ চলে যায় দেয়ালের দিকে। তিন দেয়াল জুড়ে ছবির বদলে টাঙানো রয়েছে ফ্রেমে বাঁধানো মহেশ চৌধুরীর সংগ্রহ করা পিনে আটা সার সার ডানা মেলা প্রজাপতি। প্রতি ফ্রেমে আটটা, সব মিলিয়ে চৌষট্টি, আর তাদের রঙের বাহারে পুরো ঘরটা যেন হাসছে।

যাঁর সংগ্রহ, তিনি সোফায় বসে ছিলেন, আমাদের দেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। বুঝলাম এককালে ভদ্রলোক বেশ শক্ত সুপুরুষ ছিলেন। টকটকে রং, দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, চোখে রিমালেস চশমা, পরনে ফিনফিনে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর ঘন কাজ করা কাশ্মীরি শাল। বুঝলাম এটা মহেশ চৌধুরীর সত্তর বছরের জন্মদিন উপলক্ষে স্পেশাল পোশাক।

প্রীতীনবাবু শুধু ফেলুদার নামটাই জানেন, তাই বাকি দুজনের পরিচয় ফেলুদাকেই দিতে হল। ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই লালমোহনবাবু আমাদের অবাক করে দিয়ে বললেন, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ স্যার!

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। —থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ! বুড়োমানুষের আবার জন্মদিন। এসব আমার বৌমার কাণ্ড। —যাক আপনারা এসে গিয়ে খুব ভালই হল। হায়ার ইজ দ্য ডেড বডি খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি তো?

প্রশ্নটা শুনে আমার আর লালমোহনবাবুর মুখ একসঙ্গে হাঁ হয়ে গেছে। ফেলুদা কিন্তু ভুরুটা একটু তুলেই নামিয়ে নিল।আজ্ঞে না, অসুবিধা হয়নি।

ভেরি গুড। আমি বুঝেছিলাম। আপনি যখন গোয়েন্দা তখন হয়তো আমার সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পারবেন। তবে আপনার দুই বন্ধু মনে হচ্ছে বোঝেননি।

ফেলুদা বুঝিয়ে দিল। কৈলাস হচ্ছে কই লাশ?

এবারে লক্ষ করলাম। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চিতাবাঘের ছালের উপর বসে একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে ডান হাতে একটা চিমটের মতো জিনিস নিয়ে বাঁ হাতে ধরা একটি বিলিতি ডলের ভুরুর জায়গায় এক মনে চিমটি কাটছে। বোধহয় পুতুলের ভুরু প্লক করা হচ্ছে। আমি ওর দিকে চেয়ে আছি বলেই বোধহয় মহেশবাবু বললেন, ওটি আমার নাতনি; ওর নাম জোড়া মৌমাছি।

আর তুমি জোড়া কাটারি, বলল মেয়েটি।

বুঝলেন তো, মিঃ মিত্তির?

ফেলুদা বলল, বুঝলাম, আপনার নাতনি হলেন বিবি, আর আপনি তার দাদু। লালমোহনবাবু আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন দেখে বুঝিয়ে দিলাম। বিবি হচ্ছে Bee-Bee, আর দাদুর দা হল কাটারি। আর দু হল দুই। ফেলুদা আর আমি অনেক সময়ই বাড়িতে বসে কথার খেলা তৈরি করে খেলি, তাই এগুলো বুঝতে অসুবিধা হল না।

প্রীতীনবাবু দাদাকে ডাকি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন; আমরা তিনজনে সোফায় বসিলাম। মহেশবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসি, তিনি এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদার তাতে কোনও উসখুসে ভাব নেই, সেও দিব্যি উলটে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে।

ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল, অবশেষে বললেন মহেশ চৌধুরী, সহায় আপনার খুব সুখ্যাতি করছিল, তাই আপনি এসেছেন শুনে তিরিকে বললুম, ভদ্রলোককে

ডাক, তাকে একবার দেখি। আমার জীবনেও তো অনেক রহস্য, দেখুন। যদি তার দু-একটাও সমাধান করে দিতে পারেন।

তিরি মানে আপনার তৃতীয় পুত্র কি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

রাইট এগেন, বললেন ভদ্রলোক। আমি যে কথা নিয়ে খেলতে ভালবাসি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

ও বাতিকটা আমারও আছে।

সে তো খুব ভাল কথা। আমার নিজের ছেলেদের মধ্যে টেক্কা তবু একটু আধটু বোঝে, তিরির মাথা এদিকে একেবারেই খেলে না। তা যাক গে–আপনি গোয়েন্দাগিরি করছেন কদ্দিন?

বছর আষ্টেক।

আর উনি কী করেন? মিঃ গাঙ্গুলী?

উনি লেখেন। রহস্য উপন্যাস। জটায়ু ছদ্মনামে।

বাঃ! আপনাদের কম্বিনেশনটি বেশ ভাল। একজন রহস্য-প্লট পাকান, আরেকজন রহস্যের জট ছাড়ান। ভেরি গুড।

ফেলুদা বলল, আপনার প্রজাপতি আর পাথরের সংগ্রহ তো দেখতেই পাচ্ছি; এ ছাড়া আরও কিছু জমিয়েছেন কি কোনওদিন?

পাথরগুলো রাখা ছিল ঘরের একপাশে একটা বড় কাচের আলমারির ভিতর। এত রকম রঙের পাথর যে হয় আমার ধারণাই ছিল না। কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ এ প্রশ্ন করল কেন? ভদ্রলোকও বেশ অবাক হয়ে বললেন, অন্য সংগ্রহের কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন কেন?

আপনার নাতনির হাতের চিমটেটাকে পুরনো টুইজারস বলে মনে হচ্ছে তাই–

ব্রিলিয়ান্ট! ব্রিলিয়ান্ট! –ভদ্রলোক ফেলুদার কথার উপর তারিফ চাপিয়ে দিলেন। –আপনার অদ্ভুত চোখ। আপনি ঠিক ধরেছেন, ওটা স্ট্যাম্প কালেকটরের চিমটেই বটে। ডাকটিকিট এককালে জমিয়েছি বইকী, আর বেশ যত্ন নিয়ে সিরিয়াসলি জমিয়েছি। এখনও মাঝে মাঝে গিবনসের ক্যাটালগের পাতা উলটাই। ওটাই আমার প্রথম হবি। যখন ওকালতি করি তখন আমার এক মক্কেল, নাম দোরাবজী, আমার উপর কৃতজ্ঞতাবশে তার একটি আস্ত পুরনো অ্যালবাম আমাকে দিয়ে দেয়। তার নিজের অবিশি। শেখ মিটে গিয়েছিল, কিন্তু এ জিনিস সহজে কেউ দেয় না। বেশ কিছু দুষ্পাপ্য টিকিট ছিল সেই অ্যালবামে।

আমি নিজে স্ট্যাম্প জমাই, আর ফেলুদারও এক সময় ডাকটিকিটের নেশা হয়েছিল। ও বলল, সে অ্যালবাম দেখা যায়?

আজ্ঞে? –ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন–অ্যালবাম? অ্যালবাম তো নেই ভাই। সেটা খোয়া গেছে।

খোয়া গেছে?

বলছি না–আমার জীবনে অনেক রহস্য। রহস্যও বলতে পারেন, ট্র্যাজিডিও বলতে পারেন। তবে আজকের দিনটায় সেসব আলোচনা থাক। –এসে টেক্কা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

টেক্কা মানে বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোকের বড় ছেলে। প্রীতীনবাবুর সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকলেন। বয়সে প্রীতীনবাবুর চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। ইনিও সুপুরুষ, যদিও মোটার দিকে, আর প্রীতীনবাবুর মতো ছট্‌ফটে নন; বেশ একটা ভারভার্তিক ভাব।

তিরিকে মাইক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে আপনি ভাল জবাব পাবেন, বললেন মহেশ চৌধুরী, আর ইনি মাইকার কারবারি। অরুণেন্দ্র। কলকাতায় অফিস, হাজারিবাগ যাতায়াত আছে কর্মসূত্রে।

আর দুরি বুঝি উনি? ফেলুদা রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির দিকে দেখাল। ফ্যামিলি গ্রুপ। মহেশবাবু, তাঁর স্ত্রী, আর তিন ছেলে। অন্তত বছর পচিশ আগে তোলা, কারণ বাপের দুপাশে দাঁড়ানো দুজন ছেলেই। হাফ প্যান্ট পরা, আর তৃতীয়টি মায়ের কোলে। দাঁড়ানো ছেলে দুটির মধ্যে যে ছোট সেই নিশ্চয়ই মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে।

ঠিকই বলেছেন আপনি বললেন মহেশবাবু, তবে দুরির সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আপনার হবে কি না জানি না, কারণ সে ভাগলওয়া।

অরুণবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। বীরেন বিলেত চলে যায়। উনিশ বছর বয়সে; তারপর আর ফেরেনি।

ফেরেনি কি?—মহেশবাবুর প্রশ্নে কোথায় যেন একটা খটকার সুর।

ফিরলে কি আর তুমি জানতে না, বাবা?

কী জানি!–সেই একই সুরে বললেন মহেশ চৌধুরী। গত দশ বছর তো সে আমাকে চিঠিও লেখেনি।

ঘরে কেমন একটা থমথমে ভাব এসে গেছিল বলেই বোধহয় সেটা দূর করার জন্য মহেশবাবু হঠাৎ চাঙা হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। –চলুন, আপনাদের আমার বাড়িটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই। অখিল আর ইয়ে যখন এখনও এল না, তখন হাতে কিছুটা সময় আছে।

তুমি উঠছ কেন বাবা, বললেন অরুণবাবু, আমিই দেখিয়ে আনছি।

নো স্যার, আমার প্ল্যান করা আমার বাড়ি, আমিই দেখাব | আসুন, মিঃ মিত্তির।

দোতলায় উত্তরে রাস্তার দিকে একটা চমৎকার চওড়া বারান্দা, সেখান থেকে কানারি হিল দেখা যায়। বেডরুম তিনটে, তিনটোতেই এখন লোক রয়েছে। মাঝেরটায় থাকেন। মহেশবাবু নিজে, এক পাশে বড় ছেলে, অন্য পাশে স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে প্রীতীনবাবু। নীচে একটা গোস্টরুম আছে, তাতে এখন রয়েছেন মহেশবাবুর বন্ধু অখিল চক্রবর্তী। অরুণবাবুর দুই সন্তানের মধ্যে বড়টি ছেলে, সে এখন বিলেতে, আর মেয়েটির সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা বলে সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় রয়ে গেছে।

মহেশবাবুর বেডরুমেও দেখলাম কিছু পাথর আর প্রজাপতি রয়েছে। একটা বুকসেলফে পাশাপাশি রাখা অনেকগুলো একরকম দেখতে বইয়ের দিকে ফেলুদার দৃষ্টি গিয়েছিল, ভদ্রলোক বললেন। ওগুলো ওঁর ডায়ারি। চল্লিশ বছর একটানা ডায়রি লিখেছেন। উনি। খাটের পাশে টেবিলে ছোট্ট বাঁধানো ছবি দেখে লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, আরে, এ যে দেখছি মুক্তানন্দের ছবি।

মহেশবাবু হেসে বললেন, আমার বন্ধু অখিল দিয়েছে। ওটা। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, তিনটে মহাদেশের শক্তি এঁর পিছনে।

কারেক্ট। বললেন লালমোহনবাবু, বিরাট তান্ত্রিক সাধু। ইন্ডিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা- সর্বত্র এঁর শিষ্য।

আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি, বললেন মহেশ চৌধুরী, আপনিও এঁর শিষ্য নাকি?

আজ্ঞে না, তবে আমার পাড়ায় আছেন একজন।

দোতলায় থাকতেই একটা গাড়ির শব্দ পেয়েছিলাম, নীচে এসে দেখি, যে-দুজনের কথা মহেশবাবু বলছিলেন, তাঁরা এসে গেছেন। একজন মহেশবাবুরই বয়সী, সাধারণ ধূতি পাঞ্জাবি আর গাঢ় খয়েরি রঙের আলোয়ান গায়ে। ইনি যে উকিল-টুকিল ছিলেন না কোনওদিন সেটা বলে দিতে হয় না, আর সাহেবিয়াও কোনও গন্ধ নেই। এর মধ্যে; অন্য ভদ্রলোককে মনে হল চল্লিশের নীচে বয়স, বেশ হাসিখুশি সপ্রতিভা ভাব, মহেশবাবু আসতেই তাঁকে টিপ করে প্রণাম করলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির হাতে মিষ্টির হাঁড়ি ছিল, সেটা তিনি প্রীতীনবাবুর হাতে চালান দিয়ে মহেশবাবুর দিকে ফিরে বললেনগআমার কথা যদি শোনো তো পিকনিকের পরিকল্পনাটা বাদ দাও। একে যাত্রা অশুভ, তার উপর বাঘ পালিয়েছে। শার্দুলবাবাজী যদি মুক্তানন্দের শিষ্যটিষ্য হন তা হলে একবার ছিন্নমস্তায় হাজিরা দেওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়।

মহেশবাবু আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "আলাপ করিয়ে দিই–এই কুন্ডাকড়াকা ভদ্রলোকটি হলেন আমার অনেকদিনের বন্ধু শ্রীঅখিলবন্ধু চক্রবর্ত, এক্স-স্কুলমাস্টার, জ্যোতিষচর্চা আর আয়ুর্বেদ হচ্ছে এনার হবি; আর ইনি হলেন শ্রীমান শঙ্করলাল মিশ্র, আমার অত্যন্ত স্নেহের পত্র, বলতে পারেন আমার মিসিং পুত্রের স্থান অনেকটা অধিকার করে আছেন।

সবাই যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দেখে অখিলবাবু আরেকবার বললেন, তা হলে আমার নিষেধ কেউ মানছে না?

না ভাই, বললেন মহেশ চৌধুরী, ‘ আমি খবর পেয়েছি বাঘের নাম সুলতান, কাজেই সে মুসলমান, তান্ত্রিক নয়। – ভাল কথা, মিঃ মিত্তির যদি সময় পান তো সার্কাসটা একবার দেখে নেবেন। আমাদের ইনভাইট করেছিল। পরশু! বীেমা আর বিবিদিদিমণিকে নিয়ে আমি দেখে এসেছি। দিশি সার্কাস যে এত উন্নত করেছে জানতাম না। আর বাঘের খেলার তো তুলনাই নেই।

কিন্তু পরশু নাকি বাঘের খেলায় গোলমাল হয়েছিল? প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

সেটা খেলোয়াড়ের কোনও গণ্ডগোলে নয়। জানোয়ারেরও তো মুড বলে একটি জিনিস আছে। সে-তো আর কলের পুতুল না যে চাবি টিপলেই লক্ষ-ঝম্প করবে।

কিন্তু সেই মুড়ের ঠেলা তো এখন সামলানো দায়, বললেন অরুণবাবু। শহরে তো প্যানিক। ওটাকে এক্ষুনি মেরে ফেলা উচিত। বিলিক্তি সাকর্স হলে এ জিনিস কক্ষনও হত না।

মহেশবাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, - তুমি তো আবার বন্যপশু-সংহার সমিতির সভাপতি কি না, তোমার হাত তো নিশপিশ করবেই।

রাজরাপ্পা রওনা হবার আগে আর একজনের সঙ্গে আলাপ হল। উনি হলেন প্রীতীনবাবুর স্ত্রী নীলিমা দেবী। এঁকে দেখে বুঝলাম যে চৌধুরী পরিবারের সকলেই বেশ ভাল দেখতে।

৪. রাজরাপ্পা হাজারিবাগ থেকে আশি কিলোমিটার

রাজরাপ্পা হাজারিবাগ থেকে আশি কিলোমিটার। ৪৮ কিলোমিটার গিয়ে রামগড় পড়ে, সেখান থেকে বাঁয়ে রাস্তা ধরে গোলা বলে একটা জায়গা হয়ে ভেড়া নদী পর্যন্ত গাড়ি যায়। নদী হেঁটে পেরিয়ে খানিকদূর গিয়েই রাজরাপ্পা!

শঙ্করলাল মিশ্রের গাড়ি নেই। তিনি আমাদের গাড়িতেই এলেন। দুজন বেয়ারাকেও নেওয়া হয়েছে পিকনিকের দলে, তাদের একজন হল বুড়ো নূরমহম্মদ, যে মহেশবাবুর ওকালতির জীবনের শুরু থেকে আছে। অন্য জন হল ষণ্ডা মাক জগৎ সিং, যার জিম্মায় রয়েছে অরুণবাবুর বন্দুক আর টাটার বাক্স।

মিঃ মিশ্রকে দেখেই বেশ ভাল লেগেছিল, তার সঙ্গে কথা বলে আরও ভাল লাগল। ভদ্রলোকের জীবনের ঘটনাও শোনবার মতো। শঙ্করলালের বাবা দীনদয়াল মিশ্র ছিলেন মহেশবাবুর দারোয়ান। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে, যখন শঙ্করলালের বয়স চার- দীনদয়াল নাকি এক দিন হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। দুদিন পরে এক কাঠুরে তার মৃতদেহ দেখতে পায় মহেশবাবুর বাড়ি থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে। কোনও জানোয়ারের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দীনদয়াল ওই জঙ্গলে কেন গিয়েছিল সেটা জানা যায়নি। একটা পুরনো শিবমন্দির আছে সেখানে, কিন্তু দীনদয়াল কোনওদিন সেখানে যেত না!

এই ঘটনার পর থেকে নাকি মহেশবাবুর ভীষণ মায়া পড়ে যায় বাপহারা চার বছরের শিশু শঙ্করলালের উপর। তিনি শঙ্করলালকে মানুষ করার ভার নেন।

শঙ্করলালও খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল; পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, বি এ পাশ করে রাঁচিতে শঙ্কর বুক স্টোর্স নামে একটা বইয়ের দোকান খোলে। হাজারিবাগে ব্রাঞ্চ আছে, দু জায়গাতেই যাতায়াত আছে ভদ্রলোকের।

এই খবরটা শুনে অবিশ্যি লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করার লোভ সামলাতে পারলেন না। এই বইয়ের দোকানে বাংলা বইও পাওয়া যায় কি না।নিশ্চয়ই, বললেন শঙ্করলাল, আপনার বইও বিক্রি করেছি আমরা।

ফেলুদা সব শুনে বলল, মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে তা হলে আপনারই বয়সী ছিলেন?

বীরেন্দ্র ছিল আমার চেয়ে কয়েকমাসের ছাট, বলল। শঙ্করলাল। আমরা দুজন ইস্কুলে এক ক্লাসেই পড়েছি, যদিও কলেজের পড়াটা ওরা তিন ভাই-ই করেছে কলকাতায় ওদের এক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে থেকে। বীরেনের পড়াশুনায় মন ছিল না। সে ছিল বেপরোয়া, রোম্যান্টিক প্রকৃতির ছেলে। উনিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

ফেলুদা বলল, মহেশবাবুকি সাধুসংসর্গ-টর্গ করেন নাকি?

আগে করতেন না মোটেই, তবে ওঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি যদিও দেখিনি, তবে শুনেছি। এককালে মিলিটারি মেজাজ ছিল, প্রচুর মদ্যপান করতেন। সব ছেড়ে দিয়েছেন। সাধুসঙ্গ না করলেও, আমার বিশ্বাস আজ রাজরাপ্পায় পিকনিকের কারণ ছিন্নমস্তার মন্দির।

এটা কেন বলছেন?

উনি বাইরে বিশেষ প্রকাশ করেন না, কিন্তু আমি এর আগেও কয়েকবার রাজরাপ্পা গিয়েছি। ওঁর সঙ্গে। মন্দিরের সামনে এলে ওঁর মুখের ভাব বদলে যায় এটা লক্ষ করেছি।

অতীতে কি এমন কোনও ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যার ফলে এটা হওয়া সম্ভব?

সেটা আমি বলতে পারব না। ভুলে যাবেন না, আমি ছিলাম ওঁর দারোয়ানের ছেলে।

সাড়ে দশটা নাগাত পরপর তিনখানা গাড়ি এসে থামল ভেড়া নদীর ধারে। আমাদের গাড়িটা ছিল সবচেয়ে পিছনে; আমাদের সামনে প্রীতীনবাবুর গাড়ি। তিনি প্রথমে নামলেন গাড়ি থেকে, হাতে টেপ রেকড়ার আর নেমেই চলে গেলেন বাঁয়ে জঙ্গলের দিকে। আমরা সবাই নামলাম। মহেশবাবু ছিলেন প্রথম গাড়িতে, তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, তাড়া নেই, নদী পেরিয়েই রাজরাপ্পী, সঙ্গে ফ্লাস্কে কফি আছে, একটু রিল্যাক্স করে তবে ওপারে যাত্রা।

আমরা সবাই নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম। পাহাড়ে নদী, যাকে বলে খরস্রোতা। বর্ষার ঠিক পরে এ নদী পেরোনো নাকি মুশকিল, কারণ তখন জল থাকে হাঁটু অবধি। ছোট বড় মেজ সোজো নানান সাইজের সাদা কালো খয়েরি পটাকিলে ছিটদার সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে, পালিশ করে ব্যস্তবাগীশ ভেড়া নদী তড়িঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজরাপ্পা।

নীলিমা দেবী কফি ঢেলে দিলেন। কাগজের কাপে, আমরা সবাই একে একে গিয়ে নিয়ে নিলাম। প্রীতীনবাবুকে বোধহয় নদীর শব্দ বাঁচিয়ে পাখির ডাক রেকর্ড

করতে হবে বলে। বনের একটু ভিতর দিকে যেতে হয়েছে। পাখি যে ডাকছে নানারকম সেটা ঠিকই।

এখানে এসে নতুন যাদের সঙ্গে আলাপ হল, ফেলুদার কায়দায় তাদের একটু স্টাডি করার চেষ্টা করলাম।

বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, সে তার ডেলটাকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল, চুপটি করে বসে থাকে। দুষ্টুমি করলেই ভেড়া নদীতে ফেলে দেব, তখন দেখবে মজা।

অরুণবাবু হাত থেকে কাগজের কাপ ফেলে দিয়ে একটু দূরে একটা ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হলেন, আর তার পরেই ঝোপের মাথার উপর ধোঁয়া দেখে বুঝলাম। এই বয়সেও ভদ্রলোক বাপের সামনে সিগারেট খান না।

মহেশ চৌধুরী হাত দুটো পিছনে জড়ো করে নদীর কাছেই দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে আছেন।

ফেলুদা দুটো পাথর ঠোকাঠুকি করে সেগুলো চকমকি কি না পরীক্ষা করছিল, অখিলবাবু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আপনার রাশিটা কী জানা আছে? ফেলুদা বলল, কুম্ভ। সেটা গোয়েন্দার পক্ষে ভাল না খারাপ?

নীলিমা দেবী মাটি থেকে একটা বুনো হলদে ফুল তুলে সেটা খোঁপায় গুঁজে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে কী একটা বলায় লালমোহনবাবু মাথাটা পিছনে হেলিয়ে স্মার্টলি হাসতে গিয়ে এক লাফে বাঁয়ে সরে গেলেন, আর নীলিমা দেবী খোলা হাসি হোসে বললেন, সে কী, আপনি গিরগিটি দেখে ভয় পাচ্ছেন?

শঙ্করলালকে খুঁজতে গিয়ে দেখি উনি ইতিমধ্যে কখন জানি নদী পেরিয়ে গিয়ে ওপরে একজন গেরুয়াধারী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। একটা বাসে কিছু যাত্রী এসেছিল, তারা একটুক্ষণ আগেই নদী পেরিয়েছে সেটা দেখেছিলাম।

কফি খাওয়া শেষ, প্রীতীনবাবুও এসে গেছেন, তাই আমরা ওপারে যাবার জন্য তৈরি হলাম। ধুতি, শাড়ি, প্যান্ট সবই একটু ওপরদিকে উঠে গেল, বিবি চড়ে বসল নূর মহম্মদের পিঠে, লালমোহনবাবু জলে নামবার আগে মনে হল চোখ বুজে কী জানি বিড়বিড় করে নিলেন, পেরোবার সময় বার তিনেক বেসামাল হতে হতে সামলে নিলেন, আর ওপারে পৌঁছিয়েই বললেন ব্যাপারটা যে এত সহজ সেটা উনি ভাবতেই পারেননি।

বাকি পথটার দু পাশে গাছপালা ছিল, যদিও সেটাকে জঙ্গল বলা চলে না। তাও লালমোহনবাবু সেদিকে বারবার আড়চোখে চাওয়াতে বুঝলাম উনি বাঘের কথা ভোলেননি।

একটা মোড়ে থিয়েটারের পদার্থ সরে যাওয়ার মতো চোখের সামনে রাজরাপ্পা বেরিয়ে পড়াতে লালমোহনবাবু এত জোরে বাঃ বললেন যে পাশের গাছ থেকে একসঙ্গে দুটো ঘুঘু উড়ে পালাল।

অবিশ্যি বাঃ বলার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে দুটো নদীই দেখা যাচ্ছে। বট দিকে উত্তরে ভেড়া, আর ডাইনে নীচে দামোদর। জলপ্রপাতের জায়গাটা দেখতে হলে আরও এগিয়ে বাঁয়ে যেতে হবে, যদিও শব্দটা এখান থেকেই পাচ্ছি। সামনে আর নদীর ওপারে বিশাল বিশাল কচ্ছপের পিঠের মতো পাথর, দূরে বন, আর আরও দূরে আবছা পাহাড়ের লাইন।

মন্দির আমাদের বাঁয়ে বিশ হাতের মধ্যে। বাঝাই যায় অনেক' দিনের পুরনো, কিন্তু সেটাকে আবার নতুন করে সাজগোজ পরানো হয়েছে। এই ক' দিন আগেই কালীপুজোতে এখানে মোষ বলি হয়েছে বলে শুনলাম। লালমোহনবাবু বললেন এককালে নির্ঘাত নরবলি হত। অবিশ্যি সেটা যে খুব ভুল বলেছেন তা হয়তো না! বাসে যেসব যাত্রী এসেছে তাদের দেখার উৎসাহ নেই, তারা সবাই মন্দিরের সামনে জড়ো হয়েছে। শঙ্করলাল ঠিকই বলেছিলেন। মহেশ চৌধুরী প্রায় মিনিট খানেক ধরে মন্দিরের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন, যদিও অন্ধকারে বিগ্রহটি দেখাই যায় না। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন অন্যরা যেদিকে গেছে সেইদিকে। আমরা তিনজনও সেইদিকেই এগিয়ে গেলাম।

খানিকটা যেতেই ফলসটা দেখতে পেলাম। যেখানে বালির উপর শতরঞ্চি পাতা হচ্ছে সেখান থেকে ওটা দেখা যাবে। লালমোহনবাবু বললেন, এটা কিন্তু ফাউ হয়ে গেল মশাই। হাজারিবাগ এসে সেকেন্ড দিনেই একজন রিটায়ার্ড অ্যাডভোকেটের জন্মদিনে পিকনিকে ইনভাইটেড হবেন, এটা কি ভাবতে পেরেছিলেন?

এ তো সবে শুরু, বলল ফেলুদা।

বলছেন?

দাবা খেলেছেন কখনও?

রক্ষে করুন মশাই।

তা হলে ব্যাপার বুঝতেন। দাবার শেষ দিকে যখন দুপক্ষের পাঁচটি কি সাতটি খুঁটি বোর্ডের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন অনড় অবস্থাতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলতে থাকে। যারা খেলছে। তারা তাদের প্রত্যেকটি স্নায়ু দিয়ে ব্যাপারটা অনুভব করে। এই চৌধুরী পরিবারটিকে

দেখে আমার দাবার খুঁটির কথা মনে হচ্ছে, যদিও কে সাদা কে কালো, কে রাজা কে মন্ত্রী, তা এখনও বুঝিনি।

আমরা মন্দির আর পিকনিকের জায়গার মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটা অশ্বত্থগাছের তলায় পাথরের উপর বসলাম। এগারোটাও বাজেনি এখনও, খাবার তাড়া নেই, সবাইয়ের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত ঢিলেঢালা ভাব। অখিলবাবু বলিতে উবু হয়ে বসে বিবিকে হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছেন; নীলিমা দেবী শতরঞ্চিতে বসে তাঁর ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ইংরেজি পেপারব্যাক বার করলেন, সেটা নিঘাত ডিটেকটিভ বই; প্রীতীনবাবু একটি ঢিবির উপর বসে তাঁর টেপ রেকর্ডারে একটা নতুন ক্যাসেট ভরলেন; অরুণবাবু জগৎ সিংয়ের কাছ থেকে তাঁর বন্দুকটা নিলেন, মহেশবাবু মাটি থেকে একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সেটা নেড়ে চড়ে দেখে আবিষ্কার ফেলে দিলেন। শঙ্করলালকে দেখছি না, বললেন। লালমোহনবাবু।

আছেন, তবে দূরে, বলল ফেলুদা

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম মন্দির ছাড়িয়ে আরও বেশ কিছুটা দক্ষিণে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শঙ্করলাল কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই গেরুয়াধারীটির সঙ্গে কথা বলছেন।একটু যে সাসপিশাস্ বলে মনে হচ্ছে, মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদারও স্যাসপিশাস মনে হচ্ছে কি না সেটা জানিবার আগেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন অরুণবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। ওটা দিয়ে কি বাঘ মারা যায়? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

সার্কাসের বাঘ এতদূর আসবে না, হেসে বললেন অরুণবাবু। সাম্বার মেরেছি এটা দিয়ে, তবে সাধারণত পাখিটখিই মারি। এটা টোয়েন্টি-টু।

তাই তো দেখছি।

আপনি শিকার করেন?

শুধু মানুষ!

আপনার কি কোনও এজেন্সি নাকি? না প্রাইভেট?

ফেলুদা তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লেখা একটা কার্ড অরুণবাবুকে দিয়ে দিল ভদ্রলোক বললেন, থ্যাঙ্কস। কখন কাজে লেগে যায় বলা তো যায় না।

ভদ্রলোক যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেইদিকেই চলে গেলেন; ফেলুদা এই ফাঁকে কখন যে সেই সকলের কাগজটা পর্কেট থেকে বের করেছে সেটা দেখতেই পাইনি। লালমোহনবাবু কাগজটার দিকে ঝুকে পড়ে বললেন, বাংলা নামের কথা কী বলছিলেন মশাই?

এই দেখুন।

ফেলুদা পাশাপাশি লেখা চারটে ইংরেজি অক্ষরের দিকে দেখাল। লালমোহনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, ওটা তো মনে হচ্ছে লক্ লিখতে গিয়ে বানান ভুল করে LOKC লিখেছে।

এলোকেশী। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। এরকম ভাবে ইংরিজি অক্ষরে বাংলা কথা আমিও লিখেছি ছেলেবেলায়।

বাঃ বললেন লালমোহনবাবু, সত্যিই তো। আর এই জাপানি নামটা?

ওকাহা? এটা একটা বাংলা সেনটেন্স। OKAHA।

ও, কে, এ, এইচ, এ? এটা একটা বাংলা সেনটেনস্! একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?

ও, কে, এ, এইচ, এ-এটা তাড়াতাড়ি বলুন তো, না থেমে! দেখুন তো কী রকম শোনায়।

এবার লালমোহনবাবুর মুখে একটা বিস্ময় আর খুশি মেশানো ভাব দেখা দিল। ও কে এয়েচে! ওয়ান্ডারফুল! ...বাঃ, বাঃ, এই তো, জলের মতো সোজা। –SO—এসো; DO–দিও; NADO—এনে দিও; NHE—এনেচি। –ও বাব্বা! এটা যে বিরাট সেনটেন্‌স; এর তো শেষ নেই মশাই!–AKLO ATBB BBSO ADK SO RO ADK SO AT KLO PC LO ROT OT DD OK OJT RO OG এ আমার সাধ্য নেই।

ধৈর্য নেই বলুন। তোপ্‌সে পড়। পাংচুয়েট করে নিলে জলের মতো সোজা।

খুব বেশি না ঠেকেই পড়ে গেলাম আমি। –

এ কে এল? এটি বিবি। বিবি এসে। এদিকে এসে। আরো এদিকে এসো। এটি কে এল? পিসি এল। আর ওটি? ওটি দিদি। ও কে? ও জেঠি। আর ও? ও ঝি।

ওটা কোথায় পেলেন। আপনারা? মহেশবাবু হাসিমুখে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন।

আপনার বাগানের ধারে পড়ে ছিল, বলল ফেলুদা।

বিবিদিদিমণির সঙ্গে একটু খেলা করছিলাম আর কী।

সেটা আন্দাজ করেছি, বলল ফেলুদা। আমরা তিনজনেই উঠতে যাচ্ছিলাম, ভদ্রলোক বাধা দিয়ে আমাদের পাশেই পাথরের উপর বসে পড়লেন।

আরেকটি কাগজ দেখাব আপনাদের।

মহেশবাবুর মুখে আর হাসি নেই। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তার ভিতর থেকে একটা পুরনো ভাঁজ করা পোস্টকার্ড বার করলেন। –আমার দ্বিতীয় পুত্রের শেষ পোস্টকার্ড।

ফেলুদা পোস্টকার্ডটা নিয়ে ভাঁজ খুলল। একদিকে রঙিন ছবি। লেক সমেত জুরিখ শহরের দৃশ্য। উলটাদিকে শুধুই নাম ঠিকানা দেখে আমরা সকলেই বেশ অবাক।

মহেশবাবু বললেন, শেষের দিকে ও তাই করত। শুধু জানান দিয়ে দিত কোথায় আছে। আগেও দু-এক লাইনের বেশি লেখেনি কখনও।

ভদ্রলোক ফেলুদার হাত থেকে পোস্টকার্ডটা নিয়ে আবার ভাঁজ করে ব্যাগে রেখে দিলেন।

ফেলুদা বলল, বীরেনবাবু বিলেতে কী করতেন সেটা জানতে পেরেছিলেন?

মহেশবাবু মাথা নাড়লেন! মামুলি চাকরি করার ছেলে ছিল না বীরেন। সে ছিল যাকে বলে রেবেল। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। গতানুগতিকের একেবারে বাইরে। তার আবার একটি হিরো ছিল। বাঙালি হিরো। একশো বছর আগে তিনিও নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে বিলেত যান। তারপর শেষ পর্যন্ত ব্রেজিল না মেক্সিকো কোথায় গিয়ে আর্মিতে ঢুকে কর্নেল হয়ে সেখানকার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখান।

সুরেশ বিশ্বাস কি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। লালমোহনবাবুরও চোখ চকচক করে উঠেছে। বললেন, ইয়েস ইয়েস, সুরেশ বিশ্বাস। ব্রেজিলে মারা যান ভদ্রলোক। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস।

মহেশবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন। ওই নাম। কোত্থেকে তার একটা জীবনী জোগাড় করেছিল, আর সেটা পড়েই ওর অ্যাডভেঞ্চারের শখ হয়। আমি বাধা দিইনি। জানতাম দিলে কোনও ফল হবে না। উধাও হয়ে গেল। তারপর মাস দুয়েক পরে এল ইউরোপ থেকে এক চিঠি। হল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া. কী করছে কিছু বলে না, শুধু জানিয়ে দেয় সে আছে। চলে গেছে বলে যেমন দুঃখ হত, তেমনি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে বলে গর্বও হত। তারপর সিক্সটি সেভানের পর আর চিঠি নেই।

মহেশবাবু কিছুক্ষণ উদাস চোখে দূরের গাছপালার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সে আর আমার কাছে আসবে না। এত সুখ আমার কপালে নেই। আমার উপরে যে অভিশাপ লেগেছে!

সে কী হে, তুমি আবার অভিশাপ-টভিশাপে বিশ্বাস কর কবে থেকে?–অখিলবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। মহেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি আমার কোষ্ঠীই বিচার করেছি। অখিল, মানুষটাকে বিচার করনি।

ওইখানেই তো ভুল, বললেন অখিলবাবু, মানুষের কুষ্ঠি, মানুষের রাশি গ্রহ লগ্ন-এ সবের থেকে তো আলাদা নয় মানুষ। তোমায় বলেছিলুম। সেই ফটিটুতে, যে তোমার জীবনে একটা বড় চেঞ্জ আসছে–মনে আছে তোমার?-শুনুন মশাই–ফেলুদার দিকে ফিরলেন অখিলবাবু।-এই যে দেখছেন এঁকে এখন দেখলে বুঝতে পারছেন কি যে ইনি এককালে রাঁচি টু নেতারহাট যাবার পথে এঁর একটি পুরনো ফোর্ড গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় তার উপর রাগ করে সেটাকে পাহাড় থেকে হাজার ফুট নীচে ফেলে দিয়েছিলেন?

মহেশবাবু উঠে পড়েছিলেন। বললেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায় সেটা বলে দিতে কি জ্যোতিষীর দরকার হয়?

কথাটা বলে মহেশবাবু উত্তরদিকে চলে গেলেন, বোধহয় পাথরের সন্ধানে। অখিলবাবু বসলেন তাঁর জায়গায়। গল্প বলার মুড়ে ছিলেন ভদ্রলোক। বললেন, আশ্চর্য লোক এই মহেশ! আমি ওঁর পড়শি ছিলাম। যদিও অন্য দিক দিয়ে ব্যবধান বিস্তর। আমি শিক্ষক, আর ও উদীয়মান অ্যাডভোকেট। ওর ছেলেদের টিউশনি করেছি। কিছুদিন, সেই থেকে আলাপ। অ্যালোপ্যাথিতে আস্থা ছিল না, তাই অসুখ-টসুখ করলে মাঝে মাঝে শিকড় বাকল চেয়ে নিত আমার কাছে। সামাজিক ব্যবধানটা কোনওদিন বুঝতে দিত না। আমার ছেলেকেও নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করত। কোনও স্নবরি ছিল না।

আপনার ছেলে কী করে?

কে, অধীর? অধীর ইঞ্জিনিয়ার। বোকারোয় আছে। খড়্গপুরে পাশ করে ডুসেলডর্ফে চাকরি নিয়ে চলে গোসল। বিদেশেই ছিল বছর দশেক, তারপর-

একটা বিস্ফোরণের শব্দ অখিলবাবুর কথা থামিয়ে দিল। বন্দুক! -চেঁচিয়ে উঠল বিবি-জেঠু পাখি মেরেছে! আমরা রাত্তিরে তিতিরের মাংস খাব!

দেখি মহেশ আবার কোথায় গেল। অখিলবাবু যেন কিছুটা চিন্তিত ভাবেই উঠে পড়লেন।পাথর খুঁজতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে-টড়ে গেলে জন্মদিনটাই...

পিকনিক বলে মনে হচ্ছে না। প্রীতীনবাবুর স্ত্রী হাতের বইটা বন্ধ করে শতরঞ্চির উপর রেখে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। সবাই এমন ছড়িয়ে আছে কেন বলুন তো?

খিদে পেলেই সুড়সুড়ি করে এসে হাজির হবে, বলল ফেলুদা।

কিছু খেললে হত না?

তাস? বললেন লালমোহনবাবু, আমি কিন্তু স্কু ছাড়া আর কিছু জানি না।

তাও আবার টিলে, বলল ফেলুদা।

তাস তো আনিনি সঙ্গে, বললেন নীলিমা দেবী। এমনি মুখে মুখে কিছু খেলা যেতে পারে।

জল- মাটি- আকাশ হলে লালমোহনবাবু যোগ দিতে পারেন, বলল ফেলুদা।

সেটা আবার কী মশাই?

খুব সহজ, বললেন নীলিমা দেবী, ধরুন, আপনার দিকে তাকিয়ে আমি জল, মাটি, আকাশ এই তিনটের কোনও একটা বলে দশ গুনতে শুরু করব। জল বললে জলের, মাটি বললে মাটির, আর আকাশ বললে আকাশের একটা প্রাণীর নাম করতে হবে আপনাকে ওই দশ গোনার মধ্যে।

এটা খুব কঠিন খেলা বুঝি?

খেলে দেখুন একবার। আমি আপনাকেই প্রশ্ন করছি।

বেশ। রেডি। লালমোহনবাবু দম নিয়ে সোজা হয়ে যোগাসনে বসলেন। নীলিমা দেবী ভদ্রলোকের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন–

আকাশ! এক দুই তিন চার পাঁচ–

এঁ–এঁ–এঁ–

ছয় সাত আট নয়–

বেঙুর।

ফেলুদা অবিশ্যি জানতে চাইল বেঙুরটা কোন গ্রহের আকাশে চরে বেড়ায়। তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে ক্যাঙ, হাঙর। আর বেলুন-এই তিনটে তিনি ভেবে রেখেছিলেন, বলার সময় তালগোল পাকিয়ে গেছে। তাতে ফেলুদা বলল যে বেলুনকে প্রাণী বলা যায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু লালমোহনবাবু কথাটা মানতে চাইলেন না। বললেন, বেলুনে অক্সিজেন লাগে, প্রাণীরও অক্সিজেন ছাড়া চলে না, সুতরাং প্রাণী বলব না কেন মশাই? ফেলুদা বলল যে সে হাওয়া, হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের বেলুনের কথা শুনেছে, এমন কী কয়লার গ্যাসের বেলুনের কথাও শুনেছে, কিন্তু অক্সিজেন বেলুনের কথা এই প্রথম শুনল।

নীলিমা দেবী তর্ক থামানোর জন্য হাত তুলেছিলেন, ঠিক সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যে তর্ক আপনিই থেমে গেল।

প্রীতীন্দ্রবাবু।

মানুষে একসঙ্গে দুঃখ আর আতঙ্ক অনুভব করলে তার কীরকম ভাবভঙ্গি হতে পারে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির করা তার একটা ড্রইং ফেলুদা একবার আমাকে দেখিয়েছিল। প্রীতীনবাবুর চেহারা অবিকল সেই ছবির মতো।

ভদ্রলোক একটা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন।

নীলিমা দেবী ছুটে গেলেন স্বামীর দিকে, যদিও ফেলুদা তার আগেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে কথা বেরোতে বেশ সময় লাগল।

বা…বা…বাবা! বললেন প্রীতীনবাবু, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতটা পিছন দিকে নির্দেশ করল।

৫. মহেশবাবুকে যখন বাড়িতে আনা হয়

মহেশবাবুকে যখন বাড়িতে আনা হয় তখন প্রায় আড়াইট। তখনও জ্ঞান হয়নি ভদ্রলোকের। মাথায় চোট লেগেছে, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সটান পড়েছিলেন মাটিতে। ডাক্তার বলছেন হার্ট অ্যাটাক। ভদ্রলোকের হার্ট এমনিতেই দুর্বল ছিল, তার উপর এই বয়সে হঠাৎ কোনও কারণে শক্ পেলে এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মোটকথা, তাঁর অবস্থা ভাল নয়, সেরে ওঠার সম্ভাবনা আছে কি না সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না।

রাজরাপ্পার আমরা যেখানে বসেছিলাম, তার উত্তরে খানিকটা দূরে একটা বেশ বড় পাথরের পিছনে একটা খোলা জায়গায় মহেশবাবুকে পাওয়া যায়। এটা কোনওদিন ভুলব না। যে আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন তাঁর কাছেই দুটো হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছিল। প্রীতীনিবাবু পাহাড় বেয়ে উপর দিকের জঙ্গলে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে কিছুদূর নেমে এসে একটা ঝোপ পেরিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখেন মহেশবাবু পড়ে আছেন মাটিতে। তিনি ভেবেছিলেন ভদ্রলোক মারাই গেছেন, তাই ওরকম চেহারা করে এসেছিলেন খবর দিতে। ফেলুদা গিয়েই মহেশবাবুর নাড়ি ধরে বলল তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর মাথাটা পড়েছিল একটা থান ইটের সাইজের পাথরের উপর, তার ফলে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল পাথর আর বালির উপর।

আমরা মহেশবাবুর কাছে পৌঁছনোর মিনিটখানেক পরে প্রথম এলেন অরুণবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। তারপর এলেন অখিলবাবু। সব শেষে এলেন শঙ্করলাল মিশ্র। শেষের ভদ্রলোকটিকে যেরকম ভেঙে পড়তে দেখলাম, তাতে বুঝলাম মহেশবাবুর প্রতি তাঁর টান কত গভীর।

এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে মহেশবাবুকে তুলে ভেড়া নদী পেরিয়ে হাজারিবাগ নিয়ে আসা অসম্ভব, তাই ভদ্রলোকের দুই ছেলে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন শহরে। ডাক্তার আর অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে আসতে লাগল প্রায় আড়াই ঘণ্টা, কৈলাসে পৌঁছতে আরও এক ঘণ্টা। আমরা কিছুক্ষণ কৈলাসেই রয়ে গেলাম। পিকনিক আর হয়নি, তাই কারুর খাওয়া হয়নি। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই প্রীতীনবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্য পরোটা, আলুর দম, মাংসের কাবাব ইত্যাদি এনে দিলেন। আশ্চর্য শক্ত বলতে হবে ভদ্রমহিলা। বিবি অবিশ্যি ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না, বলছে দাদু মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। আমরা বৈঠকখানাতেই বসেছিলাম, অরুণবাবু ডাক্তারের সঙ্গে ছিলেন বাপের ঘরে, প্রীতীনবাবু মাঝে মাঝে এসে ভদ্রতার খাতিরে আমাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে যাচ্ছিলেন। শঙ্করলাল নির্বাক, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি একবারও মুখ খোলেননি। অখিলবাবুর মুখে একটাই কথা- এত করে বললাম, তাও কথা শুনল না। আমি জানতাম আজ একটা কিছু অঘটন ঘটবে।

চারটে নাগাত আমরা উঠে পড়লাম। প্রীতীনবাবু ছিলেন, তাঁকে বললাম কাল এসে খবর নিয়ে যাব কেমন থাকেন মহেশবাবু।

বাড়ি ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসলাম তিনজন। এক' দিনে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটলে মাথাটা কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করে, আমার সেই অবস্থা। ফেলুদা কথা বলছে না, তার মানে তার ভাবনা চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে ফেলছে। আমি জানি ও এখন বেশি কথা বলা পছন্দ করে না, তাও একটা জিনিস না বলে পারলাম না।

আচ্ছ ফেলুদা, ডাক্তার বলেছেন একটা শক পেলে এরকম হতে পারে, কিন্তু রাজরাপ্পাতে কী শক পেতে পারেন মহেশবাবু?

গুড কোয়েশ্চন বলল ফেলুদা, আজকের ঘটনার ওই একটা ব্যাপারই আমার কাছে অর্থপূর্ণ। অবিশ্যি শক্ পেয়েছেন কি না নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এখনও।

সেটা ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বললেন লালমোহনবাবু।

উঠবেন কি সুস্থ হয়ে?

মহেশবাবু সম্বন্ধে ফেলুদার মনে যে কীতুহলের ভাব জেগে উঠেছে, সেটা আজি কৈলাসের বৈঠকখানায় বসেই বুঝতে পারছিলাম। বেশির ভাগ সময়টাই ও ঘরের জিনিসপত্র, আলমারির বই, এই সব দেখে কাটিয়েছে। ভাবটা যে তদন্ত করছে তা নয়, বেশ টিলেঢালা, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে ও সব কিছু মনে মনে নোট করে নিচ্ছে। সেই ফ্যামিলি গ্রুপটা ও হাতে তুলে নিয়ে দেখল প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে।

আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ খেয়াল হল যে আজি ম্যাজেস্টিক সার্কাসের বাঘটার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। অবিশ্যি ধরা পড়লে নিশ্চয়ই জানা যেত। অন্তত বুলকিপ্রসাদ নিশ্চয়ই জানাত।

ঠাণ্ডাটা পড়েছে, লালমোহনবাবু তাই মাঙ্কিক্যাপটা আরও টেনে নামিয়ে নিয়ে বললেন, সিগনিফিক্যান্ট ব্যাপার।

ভদ্রলোক বোধহয় ভেবেছিলেন আমরা দুজনেই জিজ্ঞেস করব ব্যাপারটা কী; না করাতে শেষে নিজেই বললেন, যে সময়টা ঘটনাটা ঘটল, তখন কিন্তু মিসেস প্রীতীনবাবু আর খুঁকি ছাড়া আর কে কী করছিল তা আমরা কেউ জানি না।

কেন জানিব না, বলল ফেলুদা।অরুণবাবু পাখি মারার চেষ্টা করছিলেন, প্রীতীনবাবু পাখির ডাক রেকর্ড করছিলেন, অখিলবাবু মহেশবাবুকে খুঁজছিলেন,

শঙ্করলাল তাঁর সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন, আর বেয়ারা দুজন আমাদের বিশ হাত দূরে শিমুল গাছের তলায় বসে বিড়ি খাচ্ছিল।

বেয়ারাদের তো আমিও দেখেছি মশাই, কিন্তু আর সবাই সত্যি কথা বলছে কি না সেটা জানচেন কী করে?

যাঁদের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপ তাঁদের আচরণ সম্বন্ধে এত চট করে সন্দেহ প্রকাশ করতে আমি রাজি নই।

তা বটে, তা বটে।

ডিনারের মাঝখানে লালমোহনবাবু হঠাৎ একটা নতুন কথা ব্যবহার করলেন– সুপার-কেলেঙ্কারি। এটাও বলা দরকার যে কথাটা বলার সময় তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছাঁইঞ্চি লাফিয়ে উঠেছিলেন। ফেলুদা স্বভাবতই জিজ্ঞেস করল ব্যাপারটা কী।

আরো মশাই, একটা জরুরি কথাই বলা হয়নি। সাংঘাতিক ক্লু। যেখানে ডেডবডি–থুড়ি, মহেশবাবু পড়েছিলেন, তার একপাশে পায়ে কী জানি ঠেকতে চেয়ে দেখি প্রীতীনবাবুর টেপ রেকর্ডার।

সেটা এনেছেন সঙ্গে?

ভাবলাম পরে তুলব, তুলে ভদ্রলোককে দেব, তা তখন যা অবস্থা...ফেরার সময় দেখি সেটা আর নেই।

প্রীতীনবাবু তুলে নিয়েছিলেন বোধহয়।

দূর মশাই, প্রীতীনবাবু ওই দিকটাতেই ঘেঁষেননি। তা ছাড়া জিনিসটা পড়েছিল একটা ঝোপড়ার মধ্যে; পায়ে না ঠেকলে চোখেই পড়ত না।

ফেলুদা ব্যাপারটা নিয়ে কী যেন মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা টেলিফোন এল।

অরুণবাবু।

ফেলুদা দু-একটা কথা বলেই ফোনটা রেখে বলল, কৈলাস চল। মহেশবাবুর জ্ঞান হয়েছে। আমার নাম করছেন।

গাড়িতে কৈলাস যেতে লাগল এক মিনিট।

মহেশবাবুর ঘরে সকলেই রয়েছেন, এক বিবি ছাড়া। ভদ্রলোকের মাথায় ব্যান্ডেজ, চোখ আধবোজা, হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করা। ফেলুদাকে দেখে মুখে যে হাসিটা দেখা দিল সেটা প্রায় চোখে ধরাই পড়ে না। তারপর তাঁর ডান হাতটা উঠে তর্জনীটা সোজা হল।

কা কা...

একটা কাজের কথা বলছেন কি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোকের মাথাটা সামান্য নড়ে উঠল। হ্যাঁ-য়ের ভঙ্গিতে। তারপর তর্জনীর পাশে মাঝের আঙুলটাও উঠে দাঁড়াল। একের জায়গায় দুই।

এইটুকু বলে দুটো আঙুল আবার ভাঁজ হয়ে গিয়ে সেই জায়গায় বুড়ো আঙুলটা সোজা হয়ে উঠে এদিক ওদিক নড়ল।

তারপর ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে ঘাড়টা ডান দিকে ঘোরালেন। ওদিকে বেডসাইড টেবিল। তার উপর মুক্তানন্দের ছবি।

ছবির দিকে হাতটা বাড়ানোর চেষ্টা করতে অরুণবাবু ছবিটা বাপের দিকে এগিয়ে দিলেন। মহেশবাবু সেটা নিজে না নিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। অরুণবাবু

ছবিটা ফেলুদাকে দেবার পর মহেশবাবু আবার দু আঙুল দেখালেন। কী যেন একটা বলতেও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারলেন না।

এর পরে আর কোনও কথা বলতে পারেননি মহেশ চৌধুরী।

৬. তিন মহাদেশের শক্তি

তিন মহাদেশের শক্তি যাঁর পিছনে, সেই মুক্তানন্দের ফ্রেমে বাঁধানো পাসপোর্ট সাইজের ছবি এখন আমাদের ঘরে। আমরা চলে আসার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মহেশবাবু মারা যান। যাবার আগে ফেলুদার উপর যে তিনি কী দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সেটা ফেলুদা বুঝলেও, আমি বুঝিনি। আর লালমোহনবাবুও নিশ্চয়ই বোঝেননি, কারণ উনি বললেন মহেশঝাবু নাকি ফেলুদাকে মুক্তানন্দের শিষ্য হতে বলে গেছেন। ফেলুদা যখন জিজ্ঞেস করল যে ছবিটা দেবার পরে দুটো আঙুল দেখানোর মানে কী, তখন লালমোহনবাবু বললেন মুক্তানন্দের শিষ্য হলে ফেলুদার শক্তি ডবল হয়ে যাবে এটাই বাঝাতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক। অবিশ্যি কাঁচকলা দেখালেন কেন সেটা বোঝা গেল না। স্বীকার করলেন। লালমোহনবাবু।

পরদিন সকালে অখিলবাবুর টেলিফোনে আমরা মৃত্যুসংবাদটা পেলাম।

এগারোটা নাগাদ শ্মশান থেকে ফেরার পথে লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কৈলাসে যাবেন, না বাড়ি যাবেন? ফেলুদা বলল, এবেলা ওদিকটা না মাড়ানোই ভাল; অনেকে সমবেদনা জানাতে আসবে, কাজ হবে না কিছুই।

কী কাজের কথা বলছেন?

তথ্য সংগ্রহ।

দুপুরে খাবার পর বরান্দায় বসে ফেলুদা ওর সবুজ খাতায় কিছু নোিট লিখল। সেটা শেষ হলে এইরকম দাঁড়াল–

১। মহেশ চৌধুরী-জন্ম ২৩শে নভেম্বর ১৯০৭, মৃত্যু ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৭ (স্বাভাবিক হার্ট অ্যাটাক? শক?)। হেঁয়ালিপ্রিয়। ডাকটিকিট, প্রজাপতি, পাথর।

দোরাবাজীর দেওয়া মূল্যরান স্ট্যাম্প অ্যালবাম লোপাট (How?) মেজো ছেলের প্রতি টান। অন্য দুটির প্রতি মনোভাব কেমন? শঙ্করলালের প্রতি অপত্য স্নেহ। সুন্নবারি ছিল না। অতীতে মেজাজী, মদ্যপ। শেষ বয়সে সাত্ত্বিক, সদাশয়। অভিশাপ কেন?)

২। ঐ স্ত্রী- মৃত। কবে?

৩। ঐ বড় ছেলে অরুণেন্দ্র- জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৬। অভ্রব্যবসায়ী। কলকাতা-হাজারিবাগ যাতায়াত। মৃগয়াপ্রিয়! স্বল্পভাষী।

৪। ঐ মেজো ছেলে বীরেন্দ্র- জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৯। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ১৯ বছর বয়সে দেশ- ছাড়া। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের ভক্ত। বাপকে বিদেশ থেকে চিঠি লিখিত ৬৭ পর্যন্ত। জীবিত? মৃত? বাপের ধারণা সে ফিরে এসেছে?

৫। ছোট ছেলে প্রীতীন্দ্র- অরুণের সঙ্গে ব্যবধান অন্তত ৯-১০ বছর (ভিত্তি : ফ্যামিলি গ্রুপ)। অর্থাৎ জন্ম (আন্দাজ) ১৯৪৫। ইলেকট্রনিকস। পাখির গান। মিশুকে নয়। কথা বললে বেশি বলে, নিজের বিষয়; টেপ রেকড়ার ফেলে এসেছিল। রাজরাপ্পায়।

৬। প্রীতীনের স্ত্রী নীলিমা- বয়স ২৫- ২৬। সহজ, সংপ্রতিভ।

৭। অখিল চক্রবর্তী–বয়স আন্দাজ ৭০। এক্স- স্কুলমাস্টার। মহেশের বন্ধু। ভাগ্য গণনা, আয়ুর্বেদ।

৮। শঙ্করদয়াল মিশ্র–জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৯)। বীরেনের সমবয়সী! মহেশের দারোয়ান দীনদয়ালের ছেলে। দীনদয়ালের মৃত্যু ১৯৪৩। প্রশ্ন- জঙ্গলে গিয়েছিল কেন? শঙ্করকে মানুষ করেন। মহেশ। বর্তমানে বইয়ের দোকানের মালিক। মহেশের মৃত্যুতে মুহ্যমান।

৯। নূর মহম্মদ- বয়স ৭০-৮০। চল্লিশ বছরের উপর মহেশের বেয়ারা।

ফেলুদা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। দুপুরে খাওয়ার পর কৈলাসে গিয়ে শুনলাম সকলে অনেকেই এসেছিলেন, কিন্তু একটা নাগাদ সবাই চলে গেছেন। বৈঠকখানায় মহেশবাবুর দুই ছেলে আর অখিলবাবু ছিলেন, আমরা সেখানেই বসলাম। প্রীতীনবাবুর অস্থির ভাবটা যেন আরও বেড়ে গেছে; একটা আলাদা সোফার এক কোণে বসে খালি হাত কচলাচ্ছেন। অখিলবাবু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর মাথা নাড়ছেন। অরুণবাবু যথারীতি গভীর ও শান্ত 1 ফেলুদা তাঁকেই প্রশ্নটি করল।

আপনারা কি কিছুদিন আছেন?

কেন বলুন তো?

আপনাদের একটু সাহায্যের দরকার। মহেশবাবু একটা কাজের ভার দিয়ে গেছেন আমাকে, কী কাজ সেটা অবিশিষ্ট স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা ছিল না। তাঁর। আমি প্রথমে জানতে চাই- উনি কী বলতে চেয়েছিলেন সেটা আপনারা কেউ বুঝেছেন কি না।

অরুণবাবু একটু হেসে বললেন, বাবার সুস্থ অবস্থাতেই তাঁর অনেক সংকেত আমাদের বুঝতে বেশ অসুবিধা হত। রাশভারি লোক হলেও ওঁর মধ্যে একটা ছেলেমানুষ দিক ছিল সেটার কিছুটা আভাস হয়তো আপনিও পেয়েছেন। আমার মনে হয় ঝাবা শেষ অবস্থায় যে কথাগুলো বললেন সেটার উপর বেশি গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল।

ফেলুদা বলল, আমার কাছে নির্দেশগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হয়নি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তবে সব সংকেত ধরতে পেরেছি। এটা বলতে পারব না। যেমন ধরুন, মুক্তানন্দের ছবি। ফেলুদা অখিলবাবুর দিকে ফিরল।আপনি ওটা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারেন। ছবিটা তো বোধহয় আপনারই দেওয়া।

অখিলবাবু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমারই দেওয়া। মুক্তানন্দ রাঁচিতে এসেছিলেন একবার। আমার তো এসবের দিকে একটু ঝোঁক আছেই চিরকাল। বেশ জেনুইন লোক বলে মনে হয়েছিল। আমি মহেশকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম– তুমি তো কোনওদিন সাধু-সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস-টিশ্বাস করলে না, শেষ বয়সে একটু এদিকে মন দাও না। তোমাকে একটা ছবি এনে দেব; ঘরে রেখে দিয়ো। মুক্তানন্দের প্রভাব খারাপ হবে না। তিনটি মহাদেশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, না হয় তোমার উপরেও একটু পড়ল। –তা সে ছবি যে সে তার খাটের পাশে রেখে দিয়েছে সেটা কালই প্রথম দেখলাম। অসুখের আগে তো। ওর শোবার ঘরে যাইনি কখনও।

আপনি ওটা সম্বন্ধে জানেন কিছু? ফেলুদা অরুণবাবুকে প্রশ্ন করল।

অরুণবাবু মাথা নাড়লেন।ও জিনিসটা যে বাবার কাছে ছিল সেটাই জানতাম না। বাবার শেবার ঘরে আমিও কালই প্রথম গোলাম।

আমিও জানতাম না।–প্রীতীনবাবুকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বলে উঠলেন।

ফেলুদা বলল, দুটো জিনিস পেলে আমার কাজের একটু সুবিধা হতে পারে।

কী জিনিস? অরুণবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

প্রথমটা হল—মহেশবাবুকে লেখা তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের চিঠি।

বীরেনের চিঠি? অরুণবাবু অবাক। ‘ বীরেনের চিঠি দিয়ে কী হবে?

আমার বিশ্বাস ওই ছবিটা মহেশবাবু বীরেনকে দেবার জন্য দিয়েছিলেন আমাকে।

হাউ স্ট্রেঞ্জ। এ ধারণা কী করে হল আপনার?

ফেলুদা বলল, ছবিটা আমাকে দিয়ে মহেশবাবু দুটো আঙুল দেখিয়েছিলেন সেটা আপনারাও দেখেছিলেন ; একটা সম্ভাবনা আছে যে দুই আঙুল মানে দুরি। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আপাতত এই বিশ্বাসেই আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু বীরেনকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়?

ধরুন মহেশবাবু যদি ঠিকই দেখে থাকেন ; যদি সে এখানে এসে থাকে।

অরুণবাবু তাঁর বাপের মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

বাবা গত পাঁচ বছরে কতবার বীরেনকে দেখেছেন তা আপনি জানেন? বিশ বছর যে ছেলে বিদেশে, বাবা তাঁর দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকে এক ঝলক দেখেই চিনে ফেলবেন এটা আপনি ভাবছেন কী করে?

আপনি ভুল করছেন অরুণবাবু, আমি নিজে একবারও ভাবছি না যে বীরেনবাবু ফিরে এসেছেন। কিন্তু তিনি যদি দেশের বাইরেও কোথাও থেকে থাকেন, তা হলেও আমার দায়িত্ব দায়িত্বই থেকে যায়। তিনি কোথায় আছেন জেনে জিনিসটা তাঁর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।

অরুণবাবু একটু নরম হয়ে বললেন, বেশ। আপনি দেখবেন বীরেনের চিঠি। বাবা সব চিঠি এক জায়গায় রাখতেন। বীরেনের চিঠিগুলো আলাদা করে বেছে রাখব।

ধন্যবাদ, বলল ফেলুদা, ‘আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে—মহেশবাবুর ডায়রি। সম্ভব হলে সেগুলোও একবার দেখব।

আমি ভেবেছিলাম অরুণবাবু এতে আপত্তি করবেন, কিন্তু করলেন না। বললেন, দেখতে চান দেখতে পাবেন। বাবা তাঁর ডায়রির ব্যাপারে কোনও গোপনতা অবলম্বন করতেন না। তবে আপনি হতাশ হবেন, মিঃ মিত্তির।

কেন?

বাবার মতো ও রকম নীরস ডায়রি আর কেউ লিখেছে কি না জানি না। অত্যন্ত মামুলি তথ্য ছাড়া আর কিছু নেই।

হতাশ হবার ঝুঁকি নিতে আমার আপত্তি নেই।

চিঠির ব্যাপারে ঠিক হল অরুণবাবু আর গ্রীতীনবাবু ভাইয়েরগুলো বেছে আলাদা করে রাখবেন, সেগুলো কাল সকালে ফেলুদাকে দেওয়া হবে। ডায়রিগুলো আজই নিয়ে যাব আমরা, আর কালই ফেরত দিয়ে দেব। বুঝলাম ফেলুদাকে অজ্ঞ রাত জগতে হবে, কারণ ডায়রির সংখ্যা চল্লিশ।

তিনজনে ভাগাভাগি করে খবরের কাগজে মোড়া মহেশ চৌধুরীর ডায়রির সাতটা প্যাকেট নিয়ে কৈলাসের কাঁকর-বিছানো পথ দিয়ে যখন ফটকের দিকে যাচ্ছি, তখন দেখলাম জোড়া-মৌমাছি তার বিলিতি ডিল হাতে নিয়ে বাগানে ঘোরাফেরা করছে। পায়ের শব্দে সে হাঁটা থামিয়ে আমাদের দিকে ঘুরে দেখল। তারপর বলল, দাদু আমাকে বলেনি।

হঠাৎ এমন একটা কথায় আমরা তিনজনেই থেমে গেলাম।

কী বলেনি দাদু? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

কী খুঁজছিল বলেনি।

কবে?

পরশু, তরাশু নরশু।

তিনদিন?

একদিন।

কী হয়েছিল বলে তো।

বিবি দূরে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে কথা বলছে, যদিও তার মন পুতুলের দিকে। সে পুতুলের মাথায় গোঁজার জন্য বাগান থেকে ফুল নিতে এসেছে। ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে বলল, দাদুর যে ঘর আছে দোতলায়, যেখানে টেবিল আছে, বই আছে আর সব জিনিস-টিনিস আছে, সেইখানে খুঁজছিল দাদু!

কী খুঁজছিলেন?

আমি তো জিজ্ঞেস করলাম। দাদু বলল কী পাচ্ছি না, কী খুঁজছি।

আবোল তাবোল বকছে, মশাই চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

আর কিছু বলেননি দাদু? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

দাদু বলল এটা হেঁয়ালি, পরে মানে বলে দেব, এখন খুঁজতে দাও। তার পর আর বলল না দাদু। দাদু মরে গেল।

ইতিমধ্যে ডালের মাথায় ফুল গোঁজা হয়ে গেছে, বিবি বাড়ির দিকে চলে গেল, আর আমরাও হলাম বাড়িমুখো।।

৭. ফেলুদা এখন মহেশ চৌধুরীর ডায়রি নিয়ে বসবে

ফেলুদা এখন মহেশ চৌধুরীর ডায়রি নিয়ে বসবে, তাকে ডিসটার্বন করাই ভাল, তাই আমরা দু জনে চারটি নাগাদ চা খেয়ে একটু ঘুরুব বলে গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবুর ধারণা শহরের দিকে গেলে হয়তো সুলতানের লেটেস্ট খবর পাওয়া যেতে পারে। —মহেশ চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার দাদা যতই রহস্যের গন্ধ পেয়ে থাকুন না কেন, আমার কাছে বাঘ পালানোর ঘটনাটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর।

বাঘের খবর পেতে বেশি দূর যেতে হল না। পেট্রোল নেবার দরকার ছিল, মেন রোডে ব্রিজভূষণ তেওয়ারির পেট্রোল পাম্পের সামনে ভিড় দেখেই বুঝলাম বাঘের আলোচনা হচ্ছে, কারণ একজন ভদ্রলোক থাবা মারার ভঙ্গি করলেন কথা বলতে বলতে।

লালমোহনবাবু গাড়ি থেকে নেমে সটান এগিয়ে গেলেন জটলার দিকে। ভদ্রলোক এককালে রাজস্থানে যাবেন বলে বই পড়ে কিছুটা হিন্দি, শিখেছিলেন, কিন্তু এখন সেটা ফেলুদার ভাষায় আবার শেয়ালের স্ট্যান্ডার্ডে নেমে গেছে। তার মানে কেয়া হুয়া-র বেশি এগোনো মুশকিল হয়। তবু ভাল, ভিড়ের মধ্যে একজন বাঙালি বেরিয়ে গেল। তার কাছেই জানলাম যে হাজারিবাগের পুবে বিষ্ণুগড়ের দিকে একটা বনের মধ্যে নাকি সুলতানকে পাওয়া গিয়েছিল। ট্রেনীর চন্দ্রনের সঙ্গে বনবিভাগের শিকারি নাকি বাঘটার দিকে এগিয়ে যায়। একটা সময় মনে হয়েছিল যে বাঘটা ধরা দেবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটা চন্দ্রনকে একটা থাকা

মেরে পালিয়ে যায়। গুলিও চলেছিল, কিন্তু বাঘাটা জখম হয়েছে কি না জানা যায়নি। চন্দ্রন অবিশ্যি জখম হয়েছে, তবে তেমন গুরুতরভাবে নয়। সে এখন হাসপাতালে।

লালমোহনবাবু বললেন, কান্ডারিকারের কোনও খবর জানেন?

এটা শুধরাতেই হল। বললাম, কান্ডারিকার নয়, কারান্ডিকার-যিনি বাঘের আসল ট্রেনার।

ভদ্রলোক বললেন তার খবর জানেন না, তবে এটা জানেন যে বাঘের অভাবে নাকি সাকসের বিক্রি কিছুটা কমেছে।

বাঘের দিকে গুলি চলেছে জেনে কারান্ডিকারের মনোভাব কী হল সেটা জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল আমাদের দুজনেরই, তাই পেট্রোল নিয়ে সোজা চলে গেলাম গ্রেট ম্যাজেস্টিকে।

ফেলুদা সঙ্গে থাকলে দেখেছি। লালমোহনবাবু নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে সাহস পান না; আজ দেখলাম সোজা গেটে গিয়ে বললেন, পুট মি খুঁটু মিস্টার কুট্টি প্লিজ। গেটের লোকটা কী বুঝল জানি না। হয়তো সেদিন আমাদের চিনে রেখেছিল, তাই আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমাদের ঢুকতে দিল, আর আমরাও সোজা গিয়ে হাজির হলাম মিঃ কুট্টির ক্যারাভানে।

কুট্টির কাছে যে খবরটা পেলাম সেটাকেও একটা হেঁয়ালি বলা চলে।

কারান্ডিকার নাকি কাল রাত থেকে হাওয়া।

দু দিন থেকেই পাবলিক আবার বাঘের খেলা ডিমান্ড করতে শুরু করেছে, বললেন মিঃ কুট্টি। আমি নিজে কারান্ডিকারের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছি। বলেছি সে ছাড়া আর কেউ বাঘ ট্রেন করবে না। কিন্তু তাও সে না বলে চলে গেল।

এর মধ্যেও দু-এক দিন বেরিয়েছে, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু আজ সে এখনও ফিরল না।

খবরটা শুনে সার্কাসের বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন, সুলতান-ক্যাপচারের দৃশ্য আর দেখা হল না, তপেশ। এমন সুযোগ আর আসবে না।

আমারও মনটা খারাপ লাগছিল, তাই ঠিক করলাম গাড়িতে করে কোথাও একটু বেরিয়ে আসব। উত্তরে যাব না। দক্ষিণে যাব।–অর্থাৎ কনারি হিলের দিকে যাব না। রামগড়ের দিকে যাব-সেটা ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত টস করলাম। দক্ষিণ পড়ল। লালমোহনবাবু বললেন, ওদিকটাতেও একটা পাহাড় আছে, সেদিন যাবার পথে দেখেছি। খাসা দৃশ্য।

দৃশ্য ভাল ঠিকই, কিন্তু এগারো কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছু দূর গিয়েই একটা কালভার্টের ধারে যে ঘটনাটা ঘটল, সেটাকে মোটেই ভাল বলা চলে না।

মাত্র ছ। মাস আগে কেনা লালমোহনবাবুর অ্যাম্বাসাডর বার তিনেক হেঁচকি তুলে মিনিট খানেক গো স্লো করে অবশেষে বেমালুম ধর্মঘটের দিকে চলে গেল। বোধহয় তেল টানাচে না, বললেন হরিপদবাবু।

ঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি। সূর্য আকাশের নীচের দিকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, কারণ পশ্চিমে দূরে শালবনের মাথার উপর মেঘ জমে আছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে কালভার্টের উপর গিয়ে বসলাম, হরিপদবাবু গাড়ি নিয়ে পড়লেন। লালমোহনবাবুকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি ড্রাইভারের উপর নির্ভর করতে হয়, কারণ উনি গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। উনি বলেন, আমার নিজের পায়ের ভেতর কাট হাড় আছে কটা মাস্‌ল আছে না জেনে যখন দিব্যি

চলে ফিরে বেড়াচ্ছি, তখন গাড়ির ভেতর কী কলকজ্জা আছে সেটা জানার কী নেসেসিটি ভাই?

মেঘের গায়ে নীচের দিকে একটা খড়খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে একটিবার উঁকি দিয়ে সূর্যদেব যখন আজকের মতো ছুটি নিলেন, হরিপদবাবু সেই সময় জানালেন যে তিনি রেডি–চলে আসুন, স্যার।

কালভর্টি থেকে উঠে আরেকবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি পাঁচটা তেত্রিশ। সময়টা জরুরি, কারণ ঠিক তখনই আমরা দেখলাম সুলতানকে

খবরটা আরও অনেক নাটকীয়ভাবে দিতে পারতাম, কিন্তু ফেলুদা বলে এটাই ঠিক। –গাদাগুচ্ছের মরচে-ধরা বিশেষণ আর তথাকথিত লোম-খাড়া-করা শব্দ ব্যবহার না। করে চোখে যা দেখলে সেইটো ঠিক ঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ দেবে ঢের বেশি। আমিও সেটাই করার চেষ্টা করছি।

খাঁচার বাইরে বাঘ এর আগেও একবার দেখেছি, যেটার কথা রয়েল বেঙ্গল রহস্যে আছে। কিন্তু সেখানে আমাদের সঙ্গে আরও অনেক লোক ছিল। শিকারি। আর বন্দুক তো ছিলই, সবচেয়ে বড় কথা-ফেলুদা ছিল। তার উপরে আমি আর লালমোহনবাবু ছিলাম। ছের উপর, বাঘের নাগালের বাইরে। এখানে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছি খোলা রাস্তায়, যার দু দিকে বন, অদূরে একটা পাহাড়, যাতে ভল্লুক আছেই, আর সময়টা সন্ধে। এই সময় এই অবস্থায় আমাদের থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে পশ্চিম দিকের বন থেকে বেরিয়ে বাঘটা রাস্তার উপর উঠল। আমরা তিনজনে ঠিক একসঙ্গে একই সময় বাঘটা দেখেছি, কারণ আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজনও ঠিক সেই ভাবেই কাঠ হয়ে গেল। হরিপদবাবুর বা হাতটা গাড়ির দরজার দিকে বাড়িয়ে ছিলেন, সেই বাড়ানোই রয়ে গেল; লালমোহনবাবু নাক ঝাড়বেন বলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা নাকের দু পাশে ধরে শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়েছিলেন, তিনি সেই ভাবেই

রয়ে গেলেন; আমি ধুলো ঝাড়বার জন্য আমার ডান হাতটা আমার জিনসের পিছন দিকে নিয়েছিলাম, তার ফলে শরীরটা একটু বেঁকে গিয়েছিল, বাঘটা দেখার ফলে শরীরটা সেইরকম বেঁকেই রইল।

রাস্তায় উঠে বাঘাটা ঠিক চারু পা গিয়ে থেমে গেল। তারপর মাথাটা ঘোরাল আমাদের দিকে।

আমার পা কাঁপতে শুরু করেছে, বুকের ভিতরে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। অথচ আমার চোখ কিছুতেই বাঘের দিক থেকে সরছে না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছি যে আমার ডান পাশে আবছা কালো জিনিসটা হচ্ছে লালমোহনবাবুর মাথা, আর সেটা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আন্দাজে বুঝলাম তাঁর পা অবশ হয়ে যাবার ফলে শরীরের ভর আর বইতে পারছে না। এটাও বুঝতে পারছিলাম যে আমার দৃষ্টিতে কী জানি গণ্ডগোল হচ্ছে, কারণ বাঘের আউটলাইনটা বার বার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, আর গায়ের কালো ডোরাগুলো স্থির না থেকে ভাইব্রেট করছে।

সুলতান যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদের দেখল, সেটার আন্দাজ দেওয়া মুশকিল। মনে হচ্ছিল সময়টা অফুরন্ত। লালমোহনবাবু পরে বললেন কম করে আট-দশ মিনিট; আমার মতে আট-দশ সেকেন্ড, কিন্তু সেটাও যথেষ্ট বেশি।

দেখা শেষ হলে পর মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে আরও চার পা ফেলে বাঘ রাস্তা পেরিয়ে গেল। সাহস একটু বাড়াতে ধীরে ধীরে ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম শাল সেগুন সরল শিশু শিমুল আর আরও অনেক সব শুকনা গাছের জঙ্গলে সুলতান অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশ্চর্য এই যে, এর পরেও আমরা অন্তত মিনিটখানেক (লালমোহনবাবুর বর্ণনায় পনেরো মিনিট) প্রায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পর তিন জনে কেবল

তিনটে কথা বলে গাড়িতে উঠলাম-হরিপদবাবু চলুন, আমি আসুন আর লালমোহনবাবু ছঃ। খুব বেশি ভয় নিয়ে কথা বলতে গেলে লালমোহনবাবুর এ রকম হয় এটা আমি আগেই দেখেছি। ডুয়ার্সে মহীতোষ সিংহরায়ের বাড়িতে আমরা তিনজনে একঘরে শুয়েছিলাম। এক দিন রাত্রে ঘরের বন্ধ দরজাটা হাওয়াতে খট্ খট্ করায় উনি কে না বলে খে বলেছিলেন।

হরিপদবাবুর নির্ভটা দেখলাম মোটামুটি ভাল। ফেরার পথে স্টিয়ারিং হুইলে হাত-টাত কাঁপোনি। উনি নাকি এর আগেও রাস্তায় বাঘ দেখেছেন, জামসেদপুরে ড্রাইভারি করার সময়।

বাড়ি ফিরে দেখি ফেলুদা তখনও মহেশবাবুর ডায়রিতে ডুবে আছে। আমার মনে হচ্ছিল সুলতানের খবরটা লালমোহনবাবু দিতে পারলে খুশি হবেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না। ভদ্রলোক লেখেন-টেখেন বলেই বোধহয় সরাসরি খবরটা না দিয়ে একটু পাঁয়তারা কষে নিলেন। বার দু-তিন ভূঁই হুঁ ই করে কী একটা গানের সুর ভেঁজে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, তপেশ, বাঘের পায়ের তলায় বোধহয় প্যাডিং থাকে, তাই না?

আমি মজা দেখছি; বললাম, তাই তো শুনেছি।

নিশ্চয়ই তাই; নইলে এত কাছ দিয়ে গেল আর কোনও শব্দ হল না?

লালমোহনবাবুর পাঁয়তারা কিন্তু মাঠে মারা গেল। ফেলুদা আমাদের দিকে চাইলও না, কেবল একটা ডায়ারি সরিয়ে রেখে আর একটা হাতে নিয়ে বলল, আপনারা যদি বাঘটাকে দেখে থাকেন, তা হলে কটার সময় কোনখানে দেখেছেন সেটা বনবিভাগে ফোন করে। জানিয়ে দেওয়া উচিত ইমিডিয়েটলি।

লালমোহনবাবু বললেন, টাইম পাঁচটা তেত্রিশ, লোকেশন রামগড়ের রাস্তায় এগারো কিলোমিটার পোস্টের পরের কালভার্টের কাছে।

বেশ তো, পাশের ঘরে ডিরেকটরি রয়েছে, আপিসে এখন কেউ নেই, আপনি একেবারে ডি-এফ-এর বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিন। ওদের উপকার হবে।

আচ্ছা, হুঁ, তা হলে. লালমোহনবাবু দেখলাম মাস্‌লগুলোকে টান করে নিচ্ছেন। –কী ভাবে পুট করা যায় ব্যাপারটা? ইংরেজিতেই বলব তো?

হিন্দি ইংব্রিজি যেটায় বেশি দখল তাতেই বলবেন।

দি টাইগার হুইচ এসকেপূর্ড ফ্রম দি. এসকেপূর্ডই বলব তো?

সহজ করে নিয়ে র‍্যান অ্যাওয়ে বলতে পারেন।

এসকেপটা বোধহয় ম্যানেজ করতে পারব।

তা হলে তাই বলুন।

নম্বর বার করে দিলাম। আমি। ফোনটাও বোধহয় আমি করলেই ভাল হত, কারণ লালমোহনবাবু দি সার্কাস হুইচ এসকেপগু ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার–থুড়ি, বলে থেমে গেলেন। ভাগ্যিস ভদ্রলোক কথাটা খুব চেঁচিয়ে বলেছিলেন। ফেলুদা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে টেলিফোনটা ওঁর হাত থেকে ছিনিয়ে খবরটা নিজেই দিয়ে দিল।

৮. ফেলুদার ঘরেই চা এনে দিল

ফেলুদার ঘরেই চা এনে দিল বুলাকিপ্রসাদ। আমরা আসার আগেই বাঘের হাতে চন্দ্রনের জখম হবার খবরটা ফেলুদা বুলকিপ্রসাদের কাছে পেয়ে গিয়েছিল; ফেলুদার ধারণা কারান্ডিকার ছাড়া এই বাঘ জ্যান্ত ধরার সাধ্যি কারুর নেই।

লালমোহনবাবু। গরম চায়ে একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন, কিছু পেলেন ও ডায়রিতে? নাকি অরুণবাবুর কথাই ঠিক?

আপনিই বলুন না।

ফেলুদা একটা ডায়ারি খুলে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

লালমোহনবাবু পড়লেন 'Self elected President of club–meeting on 8.4.46—তারপর আরেকটা পাতা খুলে পড়লেন–Tea Party at Brig. Sudarshan's আর তার পরের পাতায়–Trial for new suit at Shakurs-4 P.M...কী মশাই, এসব খুব তাৎপর্যপূর্ণ বুঝি?

তোপ্‌সে, তোর কী মনে হয়?

আমি লালমোহনবাবুর পিছন দিয়ে বুকে পড়ে দেখছিলাম, এবার ডায়রিটা হাতে নিয়ে নিলাম। আলোর কাছে আন্‌ বলল ফেলুদা।

টেবিল ল্যাম্পের নীচে ডায়রিটা ধরে চোখটা কাছে নিতেই একটা শিহরন খেলে গেল। আমার শিরদাঁড়ায়।

বেশ বড় সাইজের ডায়রি, তার পাতার মাঝখানে ফাউনটেন পেনে ইংরেজিতে লেখা ছাড়াও অন্য লেখা রয়েছে। যেটা প্রায় চোখে দেখা যায় না। পাতার

একেবারে উপর দিকে ছাপা তারিখেরও উপরে, খুব সরু করে কাটা হার্ড পেনসিল দিয়ে খুদে খুদে অক্ষরে হালকা লেখা।

কী দেখলি?

বাংলা লেখা।

কী লেখা?

এই পাতাটায় লেখা- পাঁচের বশে বাহন ধ্বংস।

সর্বনাশ, বললেন লালমোহনবাবু, এ যে আবার হেঁয়ালি দেখছি মশাই।

তা তো বটেই, বলল ফেলুদা, এবার এটা দেখুন। এটা ১৯৩৮ অর্থাৎ প্রথম বছরের ডায়রি, আর এটাই পেনসিলে প্রথম সাংকেতিক লেখা।

১৯৩৮- এর ডায়রির প্রথম পাতাতেই লিখেছেন ভদ্রলোক শাস্তু দুই- পাঁচের বশ।

শঙ্কুটি কে? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, ভদ্রলোক নিজের বিষয় বলতে গেলে সব সময়ই শিবের কোনও না কোনও নাম ব্যবহার করেছেন।

শিবের নাম তো হল, কিন্তু দুই- পাঁচের বশ তো বোঝা গেল না।

রিপু বোঝেন? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

মানে ছেঁড়া কাপড় সেলাই- টেলাই করা বলছেন?

আপনি ফারসি- সংস্কৃত গুলিয়ে ফেলছেন, লালমোহনবাবু! আপনি যেটা বলছেন সেটা হল রিফু। আমি বলছি রিপু।

ওহো- ষড়রিপু? মানে শত্রু?

শত্রু। এবার মানুষের এই ছটি শত্রুর নাম করুন তো।

ভেরি ইজি। কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য।

হল না। অর্ডারে ভুল। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। অর্থাৎ দুই আর পাঁচ হল ক্রোধ আর মদ।

ওয়ান্ডারফুল? বললেন লালমোহনবাবু, এ তে মিলে যাচ্ছে মশাই।

এবার তা হলে প্রথমটা আর একবার দেখুন, এটাও মিলে যাবে।

এবারে আমার কাছেও ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে। বললাম, বুঝেছি, দুইয়ের বশে বাহন ধ্বংস হচ্ছে, রাগের মাথায় গাড়ি ভাঙা।

ভেরি গুড, বলল ফেলুদা, তবে দুই- পাঁচ নিয়ে একটা সংকেতের এখনও সমাধান হয়নি।

যে ডায়রিগুলো দেখা হয়ে গেছে, সেগুলোর বিশেষ বিশেষ জায়গায় কাগজ গুঁজে রেখেছে ফেলুদা। তারই একটা জায়গা খুলে আমাদের দেখাল। লেখাটা হচ্ছে––২+৫=X ।

লালমোহনবাবু বললেন, এক্স তো মশাই আননোন কোয়ান্টিটি। ওটা বাদ দিন। আর সব সংকেতেরই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মানে থাকবে সেটাই বা ভাবছেন কেন?

ফেলুদা বলল, যেখানে একটা লোক বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে মাত্র পনেরো-বিশ দিন সংকেতের আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে কারণটা যে জরুরি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কাজেই X-এর রহস্য আমাকে উদঘাটন করতেই হবে।

ওই তারিখের কাছাকাছি কোনও লেখা থেকে কোনও হেলপ পাচ্ছেন না?

ওর দশদিন পরে আর একটা সংকেত আছে। দেখুন–

এটাও আমার কাছে অসম্ভব কঠিন বলে মনে হল। লেখাটা হচ্ছে-অনর্গল-ঘৃতকুমারী।

ফেলুদা বলল, লোকটা যে কথা নিয়ে কী না করেছে তাই ভাবছি।

আপনি ধরে ফেলেছেন?

আপনিও পারবেন-একটু হেলপ করলে।

ঘৃতকুমারী তো কবরেজির ব্যাপার মশাই, বললেন লালমোহনবাবু।

হ্যাঁ, বলল ফেলুদা, ঘৃতকুমারী তেল মাথায় মাখলে মাথা ঠাণ্ডা রাখে। অর্থাৎ রাগ কমায়।

কিন্তু তেল অনর্গল মাখতে হয় এ তো জানতুম না মশাই।

ফেলুদা হেসে বলল, আপনি ড্যাশটা অগ্রাহ্য করছেন কেন? ওটারও একটা মানে আছে। আর অর্গল মানে জানেন তো?

কপট। খিল।

এবার ওই দ্বিতীয় মানেটার সঙ্গে একটা নেগেটিভ জুড়ে দিন।

অখিল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। তার মানে অখিলবাবু ওঁকে ঘৃতকুমারী ব্যবহার করতে বলেছিলেন।

সাবাশ। এবার পরেরটা দ্যাখ।

তিন পাতা পরে পড়ে দেখলাম- আজ থেকে পাঁচ বাদ। তার মানে মহেশবাবু মদ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তার এক মাস বাদেই মহেশবাবু লিখছেন-ভোলানাথ ভোলে না। আবার পাঁচ। পাঁচেই বিস্মৃতি।

ফেলুদা বলল, কিছু একটা ভুলে থাকার জন্য মহেশবাবু আবার মদের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে-কী ভুলতে চাইছেন?

লালমোহনবাবু আর আমি মাথা চুলকোলাম! মহেশবাবু বলেছিলেন তাঁর জীবনে অনেক রহস্য। এখন মনে হচ্ছে কথাটা ঠাট্টা করে বলেননি।

ফেলুদা আর একটা জায়গায় ডায়রিটা খুলে বলল, এটা খুব মন দিয়ে পড়ে দেখুন। কথা নিয়ে খেলার একটা আশ্চর্য উদাহরণ। অনেক তথ্য, অনেক জটিল মনের ভাব এই কয়েকটি কথার মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে।

আমরা পড়লাম—আমি আজ থেকে পালক। পালক=feathere- হালকা। পালক- পালনকর্তর্গ। আজ থেকে শমির ভার আমার। শমি আমার মুক্তি।

শমি যে শঙ্করলাল মিশ্র সেটা আমি বুঝতে পারলাম। ফেলুদা বলল, শঙ্করলালকে মানুষ করার ভার বহন করতে পেরে মহেশবাবুর মন থেকে একটা ভার নেমে গেছে। এই ভারটা কীসের ভার সেইটে জানা দরকার।

ফেলুদা খাট থেকে উঠে কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে পায়চারি করল। আমি ডায়রিগুলোর দিকে দেখছিলাম। কী অদ্ভুত লোক ছিলেন এই মহেশ চৌধুরী। বেঁচে থাকলে

ফেলুদার সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাব জমে যেত, কারণ ফেলুদারও। হেঁয়ালির দিকে ঝোঁক আর হেঁয়ালির সমাধানও করতে পারে আশ্চর্য চটপট।

লালমোহনবাবু খাটের এক কোনায় ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন। বললেন, অখিলবাবু ভদ্রলোকের এত বন্ধু ছিলেন, ওঁকে কবরেজি ওষুধ দিয়েছেন, ওঁর কুষ্ঠি ঘেঁটেছেন, তাঁর তো মহেশবাবুর নাড়ীনক্ষত্র জানা উচিত। আপনি ডায়রি না ঘেঁটে তাঁকেই জেরা করুন না।

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, এই ডায়ারিগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি আসল মানুষটার সঙ্গে যোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি। ওই পেনসিলের লেখাগুলোতে আমার কাছে মহেশ চৌধুরী এখনও বেঁচে আছেন।

ওঁর ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু পেলেন না ডায়রিতে?

প্রথম পনেরো বছরে বিশেষ কিছু নেই, তবে পরে–

একটা গাড়ি থামাল আমাদের গেটের বাইরে। ফিয়াটের হর্ন। চেনা শব্দ।

আমরা তিনজনে বারান্দায় এসে দেখলাম অরুণবাবু হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন।

মিঃ সিং-এর ওখানে যাচ্ছিলাম- এখানকার ফরেস্ট অফিসার, বললেন অরুণবাবু, তাই ভাবলাম বীরেনের চিঠিগুলো দিয়ে যাই। চিঠি অবিশ্যি নামেই। তাও আপনি যখন চেয়েছেন...

আপনাকে এই অবস্থায় এত ঝামেলার মধ্যে ফেললাম বলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত।

দ্যাট্স অল রাইট, বললেন অরুণবাবু বাবা যে কী বলতে চাইছিলেন সেটা আমার কাছে রহস্য। দেখুন। যদি আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু বার করতে পারেন।

সত্যি বলতে কী, আমি বাবার সঙ্গ খুব বেশি পাইনি। হাজারিবাগে আসি মাঝে মাঝে আমার কাজের ব্যাপারে। এককালে প্রায়ই আসতাম। শিকারের জন্য। তা, বড় শিকার তো এরা বন্ধই করে দিয়েছে। কাল একটা সুযোগ পাওয়া গেছে।- দেখি! ...

কী সুযোগ?

যে কারণে সিং- এর কাছে যাচ্ছি। খবর এসেছে রামগড়ের রাস্তায় আজ বিকেলেই নাকি বাঘাটা দেখা গেছে। এদিকে একটি ট্রেনার তো হাসপাতালে, অন্যটি মালিকের সঙ্গে ঝগড়াটিগড়া করে নিখোঁজ। আমি সিংকে বলেছি যে বাঘটাকে যদি মারতেই হয়, তো আমাকে মারতে দাও। অলরেডি তো তার দিকে গুলি চলেছে; যদি জখম হয়ে থাকে। তা হলে তো হি ইজ এ ডেঞ্জারাস বীস্ট।

আমার বলার ইচ্ছে ছিল বাঘটাকে দেখে তো জখম বলে মনে হয়নি, কিন্তু ফেলুদার ইশারাতে সেটা আর বললাম না।

আমি তো সঙ্গে থ্রি ওয়ান ফাইভটা নিচ্ছি, বললেন অরুণবাবু, কারণ এমনিতেই চারিদিকে প্যানিক। গোরু, ছাগলও গেছে এক আধটা। সকাসের খাঁচায় বন্দি অবস্থায় বুড়ো হয়ে মরার চেয়ে জঙ্গলে গুলি খেয়ে মারাটা খারাপ কীসে?...যাই হোক, আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে আপনিও আসতে পারেন। কাল সকলে বেরোধ আমরা।

দেখি... বলল ফেলুদা।আমার এই কাজটা কতদূর এগোয় তার উপর নির্ভর করছে। ভাল কথা-

অরুণবাবু যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন, ফেলুদার কথায় থামলেন। ফেলুদা বলল, সেদিন পিকনিকে আপনিই তো বন্দুক ছুঁড়েছিলেন, তাই না?

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। আপনি বোধহয় ভাবছিলেন—বন্দুক চলল, অথচ শিকার নেই কেন? গোয়েন্দার মন তো! ওয়েল, আই মিসূড ইট। একটা বটের। সেরা শিকারিরও লক্ষ্য কি সব সময় অব্যর্থ হয়, মিঃ মিত্তির?

৯. মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলের চিঠি

বিলেত থেকে লেখা মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলের চিঠিগুলো থেকে সত্যিই বিশেষ কিছু জানা গেল না। চিঠি বলতে সবই পোস্টকার্ড, তার একদিকে ছবি, অন্যদিকে ঠিকানা। যেখানে ঠিকানা ছাড়াও কিছু লেখা আছে, সেখানে বীরেন তার বাবার দেওয়া নাম ব্যবহার করেছে—দুরি।

নটায় বুলার্কিপ্রিসাদ ডিনার রেডি করে আমাদের ডাক দিল। ফেলুদা ডায়রি আর খাতা নিয়ে খেতে বসল। যে-সংকেতগুলো তৎক্ষণাৎ সমাধান হচ্ছে না, সেগুলো সে নিজের খাতায় লিখে রাখছে। বাঁ হাতে লিখছে, এবং দিব্যি লিখছে। লালমোহনবাবু একবার বললেন, লেখা বন্ধ না করলে আজকের মাংসের কারিটার ঠিক জাসটিস করতে পারবেন। না। দুর্ধর্ষ হয়েছে।

ফেলুদা বলল, বাঁদর সমস্যা নিয়ে পড়েছি, এখন মাংস-টাংস বলে ডিসটর্বে করবেন না।

আমি লক্ষ করছিলাম ফেলুদার ভুরুটা সাংঘাতিক কুঁচকে রয়েছে, যদিও ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভাসও রয়েছে। জিজ্ঞেস করতেই হল ব্যাপারটা কী। ফেলুদা ডায়রি থেকে পড়ে শোনাল-অগ্নির উপাসকের অসীম বদ্যান্যতা। নবরত্ন বাঁদরের হিসাবে দু হাজার পা।

লালমোহনবাবু বললেন, রাঁচিতে পাগলাগারদ আছে বলে ওখানকার বাসিন্দারাও নাকি একটু ইয়ে হয় বলে শুনিচি। সেটাও একটু মনে রাখবেন।

ফেলুদা এ কথায় কোনও মন্তব্য না করে বলল, অগ্নির উপাসক পার্সিদের বলে জানি, কিন্তু বাকিটা সম্পূর্ণ ধোঁয়া।

তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে, প্রথমত নবরত্ন বাঁদর বলে কোনওরকম বাঁদর হয় কি না সে বিষয়ে ওঁর সন্দেহ আছে; আর দ্বিতীয়ত, নটা রত্নের কী করে দু হাজার পা হয়, আর বাঁদর কী করে সে হিসেবটা করে সেটা কোনওমতেই বোধগম্য হচ্ছে না-এইবার আপনি খাতা বন্ধ করে একটু বিশ্রাম করুন।

লালমোহনবাবু বলার জন্য নিশ্চয়ই নয়, হয়তো চোখ আর মাথাটাকে একটু রেস্ট দেবার জন্য ফেলুদা খাবার পরে হাঁটতে বেরোল। অবিশ্যি এক নয়, আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে।

পূর্ণিমার চাঁদ এই কিছুক্ষণ হল উঠেছে, তার গায়ের রং থেকে এখনও হলুদের ছাপটা যায়নি। আকাশে মেঘ জিমেছে, তাই দেখে জটায়ু বললেন, চন্দ্রলোক ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হচ্ছে! পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে একটা দমকা বাতাস দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে একটা শব্দ ভেসে আসছে। যেটা ভাল করে শুনলে বোঝা যায় সাকসের ব্যান্ড।

ডাইনে মোড় নিয়ে দুটো বাড়ি পরেই কৈলাস। এক সারি ইউক্যালিপটাসের ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। দোতলায় একটা ঘরের জানালা খোলা, ঘরে আলো জ্বলছে। সেই আলোর সামনে দিয়ে কে যেন দ্রুত পায়চারি করছে। ফেলুদারও চোখ সেইদিকে। আমরা হাঁটা থামিয়েছি। ওটা করে ঘর? প্রীতীনবাবুর। পায়চারি করছেন নীলিমা দেবী। একবার জানালায় এসে থামলেন, আবার সরে গিয়ে পায়চারি। অস্থির ভাব।

আমরা আবার চলা শুরু করলাম। জানালাটা ক্রমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

পরপর আরও বাড়ি। প্রত্যেকটাতেই বেশ বড় কম্পাউন্ড। রেডিয়োতে খবর বলছে; কোন বাড়িতে চলছে রেডিয়ো জানি না। লালমোহনবাবু আরেকটা বেমানান রবীন্দ্র সংগীত ধরতে যাচ্ছিলেন- গুনগুনানি শুনে মনে হল ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়–

এমন সময় দেখলাম দূরে একজন লোক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে। গায়ে নীল রঙের পুলোভার।

আরেকটু কাছে এলেই চিনতে পারলাম।

আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম, নমস্কার করে বললেন শঙ্করলাল মিশ্র। চেহারা দেখে মনে হল অনেকটা সামলে নিয়েছেন, যদিও সেই হাসিখুশি ছেলেমানুষি ভাবটা এখনও ফিরে আসেনি।

কী ব্যাপার? বলল ফেলুদা।

আপনাকে একটা অনুরোধ করব।

কী অনুরোধ?

আপনি তদন্ত ছেড়ে দিন।

হঠাৎ এমন একটা অনুরোধে রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফেলুদা বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, কোন বলুন তো?

এতে কারুর উপকার হবে না, মিঃ মিত্তির।

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ থেকে একটা হালকা হাসি হেসে বলল, যদি বলি আমার নিজের উপকার হবে? মনে খট্‌কা থাকলে আমি বড় উদ্বেগ বাধ করি মিঃ মিশ্র; সেটাকে দূর না। করা অবধি শান্তি পাই না। তা ছাড়া মৃত্যুশয্যায়। একজন একটা কাজের ভার আমাদের দিয়ে গেছেন, সেটা না করেও আমার শান্তি নেই। এইসব কারণে আমাকে তদন্ত চালাতেই হবে। উপকার-অপকারের প্রশ্নটা এখানে খুব বড় নয়। ভেরি সরি, আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না। শুধু তাই নয়—এই তদন্তের ব্যাপারে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আমাকে

একটু সাহায্য করুন। মহেশবাবু সম্বন্ধে আর কেউ যাই ভাবুন না কেন, আপনি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এটা তো ঠিক?

নিশ্চয়ই ঠিক। ফেলুদার কথাটা মনে ধরতে কিছুটা সময় নিল বলেই বোধহয় জবাবটা এল একটু পরে। কিন্তু যখন এল তখন বেশ জোরের সঙ্গেই এল। নিশ্চয়ই ঠিক, আবার বললেন শঙ্করলাল। তার পর তার গলার সুরটা কেমন যেন বদলে গেল। বললেন, যে শ্রদ্ধাটা বহুদিন ধরে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে, সেটাকে কি এক ধাক্কায় ভাঙতে দেওয়া উচিত?

আপনি কি সেটাই করছিলেন?

হ্যাঁ, সেটাই করছিলাম। কিন্তু সেটা ভুল। এখন বুঝেছি সেটা মস্ত ভুল, আর বুঝতে পেরে মনে শান্তি পাচ্ছি।

তা হলে আপনার কাছে সাহায্য আশা করতে পারি?

কী সাহায্য চাইছেন বলুন, ফেলুদার দিকে সোজাসুজি চেয়ে বেশ সহজ ভাবে কথাটা বললেন শঙ্করলাল।

তাঁর দুই ছেলের প্রতি মহেশবাবুর মনোভাব কেমন ছিল সেটা জানতে চাই। চৌধুরী পরিবার সম্বন্ধে আপনি যতটা নিরপেক্ষভাবে বলতে পারবেন, তেমন অনেকেই পারবেন।

শঙ্করলাল বললেন, আমি যেটুকু বুঝেছি তা বলছি। আমার বিশ্বাস শেষ বয়সে বীরেন। ছাড়া আর কারুর উপর টান ছিল না মহেশবাবুর। অরুণদা আর প্রীতীন দুজনেই ওঁকে হতাশ করেছিল।

সেটার কারণ বলতে পারেন?

সেটা পারব না, জানেন, কারণ ওই দু ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। অনেক' দিন থেকেই। তবে অরুণদাকে যে জুয়ার নেশায় পেয়েছে সে কথা আমাকে এক' দিন মহেশবাবু বলেছিলেন। সোজা করে বলেননি, ওঁর নিজস্ব ভাষায় বলেছিলেন? আমি বুঝতে পারিনি; শেষে ওঁকেই বুঝিয়ে দিতে হল। বললেন, অরুণ গুড হলে আমি খুশি হতুম, বেটার হয়েই আমায় চিন্তায় ফেলেছে! শুনছি। নাকি আজকাল মহাজাতি ময়দানে যাতায়াত করছে নিয়মিত।- বেটার তো বুঝতেই পারছেন, আর জাতি হল রেস; মহাজাতি ময়দান হল মহেশবাবুর ভাষায় রেসের মাঠ।

ফেলুদা বলল, কিন্তু প্রীতীনবাবু তাঁকে হতাশ করবেন কেন? উনি তো ইলেক্ ট্রনিকসে বেশ–

ইলেকট্রনিকস! -শঙ্করলাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ও কি আপনাকে তাই বলেছে নাকি?

ইন্ডেভিশনের সঙ্গে ওঁরা কোনও সম্পর্ক নেই?।

শঙ্করলাল সশব্দে হেসে উঠলেন। হুরি, হরি; ইন্ডোভিশন! প্রীতীন একটা সদাগরি আপিসে সাধারণ চাকরি করে। সেটাও ওর শ্বশুরের সুপারিশে পাওয়া! প্রীতীন ছেলে খারাপ নয়, কিন্তু অত্যন্ত ইমপ্র্যাকটিক্যাল আর খামখেয়ালি। এককালে সাহিত্য-টাহিত্য করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেও খুব মামুলি। ওর স্ত্রী বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে। ও যে গাড়িটাতে এসেছে সেটাও ওর শ্বশুরের। আপিস থেকে ছুটি পাচ্ছিল না, তাই আসতে দেরি হয়েছে।

এবার আমাদের আকাশ থেকে পড়ার পালা।

তবে ওর পাখির নেশাটা খাঁটি, বললেন শঙ্করলাল, ওতে কোনও ফাঁকি নেই।

ফেলুদা বলল, আরেকটা প্রশ্ন আছে।

বলুন।

সেদিন রাজরাপ্পায় যে গেরুয়াধারীটির সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন, তিনিই কি বীরেন্দ্র?

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন শুনে শঙ্করলাল থতমত খেলেও, মনে হল চট করে সামলে নিলেন। কিন্তু উত্তর যেটা দিলেন সেটা সোজা নয়।

আপনার যা বুদ্ধি, আমার মনে হয় ক্রমে আপনি সব কিছুই জানতে পারবেন।

এটা জিজ্ঞেস করার একটা কারণ আছে, বলল ফেলুদা। যদি তিনি বীরেন হন, তা হলে মহেশবাবুর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে আমার একটা জিনিস দিতে হবে। আপনি প্রয়োজনে বীরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবেন কি?

শঙ্করলাল বললেন, মহেশবাবুর শেষ ইচ্ছা যাতে পূরণ হয়, তার চেষ্টা আমি করব। এটা আমি কথা দিচ্ছি। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। আমায় মাপ করবেন।

কথাটা বলে শঙ্করলাল যে পথে এসেছিলেন, আবার সেই পথে ফিরে গেলেন।

আমরা যে হাঁটতে হাঁটতে বেশ অনেকখানি পথ চলে এসেছিলাম সেটা বুঝতেই পারিনি। ফেলুদা টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখে বলল সাড়ে দশটা। আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। কৈলাসে সব বাতি নিভে গেছে, চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘে, সাকসের বাজনাও আর শোনা যাচ্ছে না। এই থমথমে পরিবেশে ফেলুদার বাঁদর বলে চেঁচিয়ে ওঠাটা এত অপ্রত্যাশিত যে লালমোহনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় বলতে কিছুই আশ্চর্য হলাম না। আমি অবিশ্যি বুঝেছিলাম যে ফেলুদা মহেশবাবুর

ডায়রির বাঁদরের কথা বলছে। কী অদ্ভুত মাথা ভদ্রলোকের! বলল ফেলুদা।বাঁদরেও যে বই লিখেছে সেটা তো খেয়ালই ছিল না।

আপনি সিমপিল ফ্র্যাকচারটাকে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচারে পরিণত করছেন কেন বলুন তো মশাই? শুধু বাঁদরে শানাচ্ছে না, তার উপর আবার বই-লিখিয়ে বাঁদর?

গিবন! গিবন! গিবন। বলে উঠল। ফেলুদা।

আরেব্বাস। সত্যিই তো। গিবন তো একরকম বাঁদর তো বটেই।

কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ কেন জানি মুষড়ে পড়ল। বাড়ির ফটকের কাছাকাছি। যখন পৌঁছেছি তখন চাপা গলায় বলতে শুনলাম, সাংঘাতিক দাঁও মেরেছে। লোকটা, সাংঘাতিক।

কে মশাই? জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

রাত বারোটা পর্যন্ত আমাদের ঘরে থেকে লালমোহনবাবু ফেলুদার হেঁয়ালির সমাধান দেখলেন। একটা হেঁয়ালির উত্তরের জন্য এগায়োটার সময় কৈলাসে ফোন করতে হল। ১৯১৫-র ১৮ই অক্টোবর মহেশবাবু লিখেছেন He Passes away; কার মৃত্যু সংবাদ ডায়রিতে লেখা রয়েছে জানিবার জন্য অরুণবাবুকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ওই দিনে অরুণবাবুর মা মারা গিয়েছিলেন। মা-র নাম জিজ্ঞেস করাতে বললেন হিরন্ময়ী। তার ফলে বেরিয়ে গেল He হল হি।

১৯৫৮-তে কিছু লেখা পাওয়া গেল যেগুলো পড়লে মনে হয় ইংরিজি মটো। যেমন, Be foolish, Be stubborn, Be determined । তার পর যখন এল Be leaves for England তখন বোঝা গেল। Be হচ্ছে বী অর্থাৎ বীরেন।

১৯৭৫-এর পাতায় পাওয়া গেল এ তিনের বশ। কাম ক্রোধ লোভ মাহ মদ মাৎসর্য। তিন হল লোভ।এ হচ্ছে A-অরুণবাবু!

শেষ লেখা মহেশবাবুর জন্মদিনের আগের দিন। –ফিরে আসা; ফিরে আশা-ব্যস—তার পর আর কিছু নেই।

ডায়ারি যখন শেষ হল তখন রাত একটা। ফেলুদার তখনও ঘুম আসেনি, কারণ আমি যখন লেপটা গায়ের উপর টানছি, তখন দেখলাম ও লালমোহনবাবুর দেওয়া সার্কাসের বইটা খুলল। উনি কথাই দিয়েছিলেন ওঁর পড়া হলে ফেলুদাকে পড়তে দেবেন, আর ফেলুদার পড়া হলে আমি পড়ব।

যখন তন্দ্রার ভাব আসছে, তখন শুনলাম ফেলুদা কথা বলছে, আর সেটা আমাকেই বলছে। –

কোথাও খুন হলে পুলিশে গিয়ে খুনের জায়গার একটা নকশা করে লাশ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে একটা চিহ্ন দিয়ে দেয়। সে চিহ্নটা কী জিনিস?

এক্স মার্কস দ্য স্পট। আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঠিক বলেছিস। এক্স মার্কস দ্য সম্পট।

এই এক্সটাই স্বপ্নে হয়ে গেল দু হাত তোলা পা ফাঁক করা কালী মূর্তি, যেটা অরুণবাবুর দিকে চোখ রাঙিয়ে বলছে, তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ, আর অরুণবাবু চিৎকার করে বলছেন, আমি দেখছিলাম! আমি দেখছিলাম। তারপরই কালীর মুখটা হয়ে গেল। লালমোহনবাবুর মুখ, আর যেই সেই মুখটা বলছে, এক মাসে তিন হাজার বিক্রি-ই ই-কালমোহন বেঙ্গলি!!-আমনি স্বপ্নটা ভেঙে গেল একটা শব্দে।

দরজায় ধাক্কা লাগার শব্দ। আর তার সঙ্গে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এটাও বুঝতে পারলাম।

আমার হাতটা আপনা থেকেই টেবিল ল্যাম্পের সুইচটার দিকে চলে গেল। আলো জ্বলল না। বিহারেও যে লোডশেডিং হয় এটা খেয়াল ছিল না।

মেঝেতে ধূপ করে কী একটা পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার গলা–

টর্চ জ্বাল, তোপ্‌সে–আমারটা পড়ে গেছে!

টেবিলের উপর হাতড়ে জলের গেলাসটাকে মাটিতে ফেলে ভেঙে তবে টর্চটা পেলাম। ফেলুদা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। টর্চের আলোতে তার নিষ্ফল ক্রোধটা চোখে মুখে ফুটে বেরোচ্ছে।

কে ছিল ফেলুদা?

দেখিনি, তবে অনুমান করতে পারি। লোকটা ষণ্ডা।

কী মতলবে এসেছিল, বল তো?

চুরি।

কিছু নেয়নি তো?

নেয়নি, তবে নির্ঘাত নিত–যদি আমার ঘুমটা এত পাতলা না হত।

কী নিত?

ফেলুদা এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে কেবল বিড়বিড় করে বলল, এখন দেখছি ফেলু মিত্তিরই একমাত্র লোক নয় যে মহেশ চৌধুরীর সংকেতের মানে বুঝতে পারে। যদিও এটা একটু লেটে বুঝেছে।...

১০. চোর ডাকাতের উপদ্রব

পরদিন সকালে লালমোহনবাবু সব শুনে-টুনে বললেন, আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম দরজা বন্ধ করে শোবেন। এ সব জায়গায় চোর ডাকাতের উপদ্রব তো হবেই।

আপনি তো বাঘের ভয়ে দরজা বন্ধ করেছিলেন।

আর আপনি চোরের জন্য খোলা রেখেছিলেন! বন্ধ রাখলে দুটোর হাত থেকেই সেফ। ওহে বুলাকিপ্রসাদ, চটপট ব্রেকফাস্টটা দাও ভাই!

এত তাড়া কীসের, বলল ফেলুদা।

বাঘ ধরা দেখতে যাবেন না?

ধরবে কে? কারান্ডিকার তো নিখোঁজ।

নিখোঁজ হলে কী হবে? বাঘ মারার তাল হচ্ছে সে খবর কি তার কাছে পৌঁছয়নি?–ওঃ, কী থ্রিলিং ব্যাপার মশাই। এ চান্স ছাড়া যায় না। আপনি ব্যাপারটা কী করে এত কামলি নিচ্ছেন জানি না।

আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট সেরে ডায়রি আর চিঠির প্যাকেট নিয়ে কৈলাসে যাবার জন্য তৈরি হয়েছি, এমন সময় অখিলবাবু এলেন। বললেন তাঁর এক হোমিওপ্যাথ বন্ধু কাছেই থাকেন, তাঁর কাছেই যাচ্ছিলেন, আমাদের বাড়ি পথে পড়ে বলে ঢুঁ মেরে যাচ্ছেন।

ঘৃতকুমারীতে মহেশবাবুর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল? ফেলুদা প্রশ্ন করল হালকাভাবে।

ও বাবা! এত কথাও লিখেছে নাকি মহেশ ডায়রিতে?

আরও অনেক কথাই লিখেছেন।

অখিলবাবু বললেন, আমার ওষুধের চেয়েও অনেক বেশি কাজ দিয়েছিল ওর মনের জোর। যাকে বলে উইল পাওয়ার। সে যে কী ভাবে মদ ছাড়ল সে তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে তো আর ঘৃতকুমারীতে হয়নি।

উইলের কথাই যখন তুললেন, ' বলল ফেলুদা, তখন বলুন তো মহেশবাবুর উইল সম্বন্ধে কিছু জানেন কি না। আমি অবিশ্যি দলিলের কথা বলছি, মনের জোরের কথা বলছি না।

ডিটেল জানি না, তবে এটুকু জানি যে মহেশ একবার উইল করে পরে সেটা বাতিল করে আরেকটা উইল করে।

আমার ধারণা এই দ্বিতীয় উইলে বীরেনের কোনও অংশ ছিল না।

অখিলবাবু অবাক হয়ে বললেন, এটা কি ডায়রিতে পেলেন নাকি?

না। এটা উনি মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন। সংকেতটা আপনার মনে আছে কি না জানি না। প্রথমে দুটো আঙুল দেখালেন, তারপর উই উই বললেন, আর তারপর বুড়ো আঙুলটা নাড়ালেন। দুই আঙুল। যদি দুরি হয়, তা হলে ও ছাড়া আর কোনও মনে হয় না। '

আশ্চর্য সমাধান করেছেন। আপনি বললেন অখিলবাবু। প্রথমে উইলে বীরেনের অংশ ছিল। তার কাছ থেকে চিঠি আসা বন্ধ হবার পর পাঁচ বছর অপেক্ষা করে ছেলে আর আসবে না ধরে নিয়ে গভীর অভিমানে বীরেনকে বাদ দিয়ে মহেশ নতুন উইল করে।

বীরেন ফিরে এসেছে জানলে কি আবার নতুন উইল করতেন?

আমার তো তাই বিশ্বাস।

এবার ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল–

বীরেন সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে, এমন কোনও সম্ভাবনা তার মধ্যে কখনও লক্ষ করেছিলেন কি?

দেখুন বীরেনের কুষ্ঠি আমিই করি। সে যে গৃহত্যাগী হবে সেটা আমি জানতাম। তাই যদি হয় তা হলে সন্ন্যাসী হবার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

আরেকটা শেষ প্রশ্ন। –সেদিন আপনি বললেন মহেশবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছেন। অথচ আপনি এলেন আমাদের পরে। আপনি কি পথ হারিয়েছিলেন? জায়গাটা তো তেমন গোলকধাঁধা নয় কিছু।

এ প্রশ্ন আপনি করবেন। সে আমি জানতাম, মৃদু হেসে বললেন অখিলবাবু। জায়গাটা গোলকধাঁধা নয় ঠিকই, তবে পথটা দুভাগ হয়ে গেছে সেটা আপনি লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই। মহেশকে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সহজই ছিল। কিন্তু ব্যাপার কী জানেন, বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার স্মৃতি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে মনে; সেই রকম একটা স্মৃতি আমাকে অন্য পথে নিয়ে যায়। সেটা অন্ন কিছুই না; পঞ্চান্ন বছর আগে ওই দিকেই একটা পাথরে আমি আমার নামের আদ্যাক্ষর আর তারিখ খোদাই করে রেখেছিলাম। গিয়ে দেখি সে পাথর এখনও আছে, আর সে খোদাইও আছে–A. B. C; 15. 5. 23–বিশ্বাস না হয় আপনি গিয়ে দেখতে পারেন।

কৈলাসে গিয়ে নূর মহম্মদের কাছে শুনলাম অরুণবাবু আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন বাঘের সন্ধানে–ছোটবাবা আছেন।

প্রীতীনবাবু দোতলায় ছিলেন, খবর দিতে নীচে নেমে এলেন। তাঁর হাতে চিঠি আর ডায়রির প্যাকেট তুলে দিয়ে চলে আসছি, এমন সময় বাধা পড়ল।

নীলিমা দেবী। তিনি ঘরে ঢুকতেই প্রীতীনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে সেটা লক্ষ করলাম।

আপনাকে একটা কথা বলার ছিল, মিঃ মিত্তির। সেটা আমার স্বামীরই বলা উচিত ছিল, কিন্তু উনি বলতে চাইছেন না।

প্রীতীনবাবু তাঁর স্ত্রীর দিকে কাতরভাবে চেয়ে আছেন, কিন্তু নীলিমা দেবী সেটা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি বলে চললেন, সেদিন বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে আমার স্বামীর হাত থেকে টেপ রেকডারটা পড়ে যায়। আমি সেটা তুলে আমার ব্যাগে রেখে দিই। আমার মনে হয় এটা আপনার কাজে লাগবে। এই নিন।

প্রীতীনবাবু আবার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে চ্যাপটা ক্যাসেট-রেকর্ডারটা কোটের পকেটে পুরে নিল।

প্রীতীনবাবুকে দেখে মনে হল তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

আমার মন বলছিল যে বাঘ ধরার ব্যাপারে ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতুহল আছে। গাড়িতে উঠে ও হরিপদবাবুকে যা নির্দেশ দিল, তাতে বুঝলাম আমার অনুমান ঠিক।

লালমোহনবাবু যতটা সাহস নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তার কিছুটা বোধহয় কমেছে, কারণ যাবার পথে একবার ফেলুদাকে বললেন, ভদ্রলোকের তো অনেক বন্দুক ছিল মশাই—একটা চেয়ে নিলেন না কেন? আপনার কোল্ট বত্রিশ এ ব্যাপারে কোনও কাজে লাগবে কি?

তাতে ফেলুদা বলল, বাঘের গায়ে মাছি বসলে সেটা মারা চলবে।

সারা পথ ফেলুদা টেপ রেকডারটা চালিয়ে ভলুম কমিয়ে কানের কাছে ধরে রইল। কী শুনল ওই জানে।

কাল রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় অনেক জায়গাই ভিজে ছিল। বড় রাস্তা থেকে একটা মোড়ের কাছে এসে কাঁচা মাটিতে টায়ারের দাগ দেখে বুঝলাম কিছু গাড়ি মেন রোড থেকে বেঁকে ওই দিকেই গেছে। আমরাও বাঁয়ের রাস্তা নিলাম, আর মাইল খানেক গিয়েই দেখলাম রাস্তার বা ধারে একটা বটগাছের পাশে তিনটে তিনরকম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—একটা বন বিভাগের জিপ, একটা অরুণবাবুর ফিয়াট আর বাঘের খাঁচাসমেত সাকাসের ট্রাক। পাঁচজন লোক গাছটার তলায় বসে ছিল, তারা বলল আধঘণ্টা হল বাঘ খোঁজার দল বনের ভিতর চলে গেছে। কোনদিকে গেছে সেটাও দেখিয়ে দিল। লোকগুলোর মধ্যে একটাকে সেদিন সােকাঁসের তাঁবুতে দেখেছি; ফেলুদা তাকেই জিজ্ঞেস করল ট্রেনারও এসেছে কি না। লোকটা বলল যে দ্বিতীয় ট্রেনার চন্দ্রন এসেছে।

আমরা রওনা দিলাম। সামনে কী অভিজ্ঞতা আছে জানি না, তবে এইটুকু জানি যে অরুণোবাবুদের হাতে বন্দুক আছে, হয়তো বনবিভাগের শিকারির হাতেও আছে, কাজেই ভয়ের কোনও কারণ নেই। লালমোহনবাবু মনে হল একটু মুষড়ে পড়েছেন তার কারণ নিশ্চয়ই কারান্ডিকগরের বদলে চন্দ্রনের আসা।

ভিজে মাটিতে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট পায়ের ছাপ গাইড হিসেবে কাজ করছে। বন ঘন নয়, শীতকালে আগাছাও কম, তাই এগোতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। এর মধ্যে দু- একবার ময়ূর ডেকে উঠেছে; সেটা যে বাঘের সংকেত হতে পারে সেটা আমরা সবাই জানি।

মিনিট দশেক চলার পর শব্দটা পেলাম।

বাঘের ডাক, তবে গর্জন বলব না। ইংরিজিতে এটাকে গ্রাউল বলে, বাংলায় হয়তো গোঙানি, কিংবা গরগরানি বা গজগজানি।। ঘন ঘন ডাক, আর বিরক্তির ডাক, বিক্রমের নয়।

আরও কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। অদ্ভুত কেন না। এ জিনিস সাকাসের বাইরে কখনও যে দেখতে পাব এটা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমাদের সামনে বাঁয়ে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দুজনের হাতে বন্দুক। একটা বন্দুক অরুণবাবুর হাতে, সেটা উচিয়ে তাগ করা আছে সামনের দিকে।

এই তিনজনের পিছনে একটা খোলা জায়গা, যেটাকে বলা যেতে পাঙ্গে সাকর্গসের রিং। এই রিং-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ডান হাতে চাবুক আর বাঁ হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে একটা লোক। বাঁ কাঁধে ব্যান্ডেজ দেখে বুঝলাম ইনিই হলেন ট্রেনার চন্দ্রন। আমার দিকে পিছন ফিরে হাতের চাবুকটা মাঝে মাঝে সপাং করে মাটিতে মেরে চন্দ্রন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে যার দিকে সে হল আমাদের কালকের দেখা গ্রেট ম্যাজেস্টিক সাকাস থেকে পালানো বাঘ সুলতান।

এ ছাড়া আরও চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাঁয়ে একটু দূরে, তাদের দুজনের হাতে যে শিকলটা রয়েছে সেটাই নিশ্চয়ই বাঘকে পরানো হবে, যদি সে ধরা দেয়।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সুলতানের হাবভাব। সে পালানোর কোনও চেষ্টা করছে না, অথচ ধরা দেবারও যেন বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। শুধু তাই নয়, তার চোখে মুখে যে রাগ আর অবজ্ঞার ভাবটা ফুটে উঠেছে সেটা সে বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছে চাপা গর্জনে।

চন্দ্রন যদিও এক পা এক পা করে এগোচ্ছে বাঘটার দিকে, তাকে দেখে মনে হয় না যে তার নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সে যে একবার জখম হয়েছে এই বাঘেরই হাতে সেটা সে নিশ্চয়ই ভুলতে পারছে না।

আমি আড়চাখে মাঝে মাঝে দেখছি অরুণবাবুর দিকে। তিনি যেভাবে বন্দুক উচিয়ে স্থির লক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বেশ বুঝতে পারছি। সুলতান বেসামাল কিছু করলেই বন্দুক গর্জিয়ে উঠে তাকে ধরাশায়ী করে দেবে। আমার বাঁ পাশে দু পা সামনে ফেলুদা পাথরের মতো দাঁড়ানো, ডাইনে লালমোহনবাবু, তাঁর মুখ এমনভাবে হাঁ হয়ে রয়েছে যে মনে হয় না। চোয়াল আর কোনওদিনও উঠবে। (ভদ্রলোক পরে বলেছিলেন যে, তাঁর ছেলেবিয়সে তিনি যত সাকাসে যত বাঘের খেলা দেখেছিলেন, তার সমস্ত স্মৃতি নাকি মুছে গেছে আজকের হাজারিবাগের বনের মধ্যে দেখা এই সাকাসে।)

চন্দ্রন যখন পাঁচ হাতের মধ্যে, তখন সুলতান হঠাৎ তার সমস্ত মাংসপেশি টান করে শরীরটা একটু নিচু করল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফেলুদা একটা নিঃশব্দ লাফে অরুণবাবুর ধারে পৌঁছে গিয়ে তাঁর বন্দুকের নলের উপর হাত রেখে মৃদু চাপে সেটাকে নামিয়ে দিল।

সুলতান!

গুরুগম্ভীর ডাকটা এসেছে আমাদের ডান দিক থেকে। যিনি ডাকটা দিয়েছেন, তাঁকে আগে থেকে দেখতে পেয়েই যে ফেলুদা এই কাজটা করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সুলতান! সুলতান!

গম্ভীর স্বরটা নরম হয়ে এল। অবাক হয়ে দেখলাম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন রিং-মাস্টার কারান্ডিকার; এরও হাতে চাবুক, পরনে সাধারণ প্যান্ট আর শার্ট। গলা অনেকখানি নামিয়ে নিয়ে পোষা কুকুর বা বেড়ালকে যেমন ভাবে ডাকে, সেই ভাবে ডাকতে ডাকতে কারান্ডিকার এগিয়ে গেলেন সুলতানের দিকে।

চন্দ্রন হতভম্ব হয়ে পিছিয়ে গেল। অরুণবাবুর বন্দুক ধীরে নেমে গেল। বনবিভাগের কর্তার মুখ লালমোহনবাবুর মুখের মতোই হাঁ হয়ে গেল। বনের মধ্যে এগারো জন হতবাক দর্শক দেখল গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের রিং-মাস্টার কী আশ্চর্য কৌশলে পালানো বাঘকে বশ করে তার গলায় চেন পরিয়ে দিল, আর তার পর সেই চেন ধরে সুলতানকে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে এল একেবারে সার্কাসের খাঁচার কাছে। তারপর খাঁচার দরজা খুলে তার বাইরে টুল রেখে দিল সার্কাসের লোক, আর কারান্ডিকার চাবুকের এক আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আপ্!' বলতেই সেই বাঘ তীরবেগে ছুটে গিয়ে টুলে পা দিয়ে আবার সার্কাসের খাঁচায় বন্দি হয়ে গেল।

আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলাম; বাঘ খাঁচায় বন্দি হওয়া মাত্র কারান্ডিকার আমাদের দিকে ফিরে একটা সেলাম ঠুকলি। তারপর সে একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। এটা একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি, আগে ছিল না।

গাড়িটা চলে যাবার পর অরুণবাবুকে বলতে শুনলাম, ব্রিলিয়ান্ট। তার পর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, থ্যাঙ্কস।

১১. কৈলাসে ফিরে এসে

কৈলাসে ফিরে এসে ফেলুদা প্রথমে অরুণবাবুর অনুমতি নিয়ে একটা টেলিফোন করল, কাকে জানি না। তারপর বৈঠকখানায় এল, যেখানে আমরা সবাই বসেছি। নীলিমা দেবী চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওঁরা তিনজনে কালই কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন; মহেশবাবুর শ্রাদ্ধ কলকাতাতেই হবে। অখিলবাবুকে বাঘের খবরটা দেওয়াতে তিনি ঘটনাটা দেখতে পেলেন। না বলে খুব আপশোস করলেন।

আমিও ভাবছি। কালই বেরিয়ে পড়ব, বললেন অরুণবাবু, অবিশ্যি যদি আপনার তদন্ত শেষ হয়ে থাকে।

ফেলুদা জানাল সব শেষ। -আপনার পিতৃদেবের শেষ ইচ্ছা পালনেও কোনও বাধা নেই। সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।

অরুণবাবু চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি তুললেন।

সে কী, বীরেনের খোঁজ পেয়ে গেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বাবা ঠিকই অনুমান করেছিলেন।

মানে?

তিনি এখানেই আছেন।

হাজারিবাগে?

হাজারিবাগে।

খুবই আশ্চর্য লাগছে আপনার কথাটা শুনে।

আশ্চর্য লাগার সঙ্গে যে একটা অবিশ্বাসের ভাবও মিশে আছে সেটা অরুণবাবুর কথার সুরেই বোঝা গেল। ফেলুদা বলল, আশ্চর্য তো হবারই কথা, কিন্তু আপনারও এরকম একটা সন্দেহ হয়েছিল, তাই নয় কি?

অরুণবাবু চায়ের কাপটা নামিয়ে সোজা ফেলুদার দিকে চাইলেন।

শুধু তাই নয়, ফেলুদা বলে চলল, আপনার মনে এমনও ভয় ঢুকেছিল যে মহেশবাবু হয়তো আবার নতুন উইল করে আপনাকে বাদ দিয়ে বীরেনকে তাঁর সম্পত্তির ভাগ দেবেন।

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব। লালমোহনবাবু আমার পাশে বসে সোফার একটা কুশান খামচে ধরেছেন। প্রীতীনবাবুর মাথায় হাত। অরুণবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন–তাঁর চোখ লাল, তাঁর কপালের রগ ফুলে উঠেছে।

শুনুন মিঃ মিত্তির, গর্জিয়ে উঠলেন অরুণবাবু, আপনি নিজেকে যত বড়ই গোয়েন্দা ভাবুন না কেন, আপনার কাছ থেকে এমন মিথ্যে, অমূলক, ভিত্তিহীন অভিযোগ আমি বরদাস্ত করব না। –জগৎ সিং!

পিছনের দরজা দিয়ে বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

আর একটি পা এগোবে না। তুমি! - ফেলুদার হাতে রিভলবার, সেটার লক্ষ্য অরুণবাবুর পিছনে জগৎ সিং- এর দিকে। –ওর মাথার একগাছা চুল কাল রাত্রে আমার হাতে উঠে এসেছিল। আমি জানি ও আপনারই আজ্ঞা পালন করতে এসেছিল আমার ঘরে। ওর মাথার খুলি উড়ে যাবে। যদি ও এক পা এগোয় আমার দিকে!

জগৎ সিং পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

অরুণবাবু কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন সোফাতে।

আ- আপনি কী বলতে চাইছেন?

শুনুন সেটা মন দিয়ে, বলল ফেলুদা, আপনি উইল চেঞ্জ করার রাস্তা বন্ধ করার জন্য আপনার বাবার চাবি লুকিয়ে রেখেছিলেন। বিবি দেখেছিল মহেশবাবুকে চাবি খুঁজতে। মহেশবাবু হেঁয়ালি করে তাঁর নাতনিকে বলেছিলেন তিনি কী হারিয়েছেন, কী খুঁজছেন। এই কী হল Key-অর্থাৎ চাবি। কিন্তু চাবি সরিয়েও আপনি নিশ্চিন্ত হননি। তাই আপনি সেদিন রাজরাপ্পায় সুযোগ পেয়ে আপনার মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন। আপনার বাবার উপর। আপনি জানতেন সেই অস্ত্রে মৃত্যু হতে পারে-এবং সেটা হলেই আপনার কার্যসিদ্ধি হবে।-

পাগলের প্রলাপ! পাগলের প্রলাপ বকছেন আপনি!

সাক্ষী আছে, অরুণবাবু- একজন নয়, তিনজন—যদিও তাঁরা কেউই সাহস করে সেটা প্রকাশ করেননি। আপনার ভাই সাক্ষী- অখিলবাবু সাক্ষী- শঙ্করলাল সাক্ষী।

সাক্ষী যেখানে নির্বাক, সেখানে আপনার অভিযোগ প্রমাণ করছেন কী করে, মিঃ মিত্তির?

উপায় আছে, অরুণবাবু। তিনজন ছাড়াও আরেকজন আছে যে নির্দ্বিধায় সমস্ত সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন করবে।

কৈলাসের বৈঠকখানায় পাখির ডাক কেন? জলপ্রপাতের শব্দ কেন?

অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে প্রীতীনবাবুর ক্যাসেট রেকর্ডার বার করেছে।

সেদিন একটি ঘটনা দেখে এবং কয়েকটি কথা শুনে বিহ্বল হয়ে প্রীতীনবাবু হাত থেকে এই যন্ত্রটা ফেলে দেন। নীলিমা দেবী এটা কুড়িয়ে নেন। এই যন্ত্রতে পাখির ডাক ছাড়াও আরও অনেক কিছু রেকর্ড হয়ে গেছে, অরুণবাবু।

এইবারে দেখলাম অরুণবাবুর মুখ ক্রমে লাল থেকে ফ্যাকাসের দিকে চলেছে। ফেলুদার ডান হাতে রিভলবার, বা হাতে টেপ রেকর্ডার।

পাখির শব্দ ছাপিয়ে মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। ক্রমে এগিয়ে আসছে গলার স্বর, স্পষ্ট হয়ে আসছে। অরুণবাবুর গলা–

বাবা, বীরু ফিরে এসেছে। এ ধারণা তোমার হল কী করে?

তারপর মহেশবাবুর উত্তর–

বুড়ো বাপের যদি তেমন ধারণা হয়েই থাকে, তাতে তোমার কী?

তোমার এ বিশ্বাস মন থেকে দূর করতে হবে। আমি জানি সে আসেনি, আসতে পারে না। অসম্ভব।

আমার বিশ্বাসেও তুমি হস্তক্ষেপ করবে?

হ্যাঁ, করব। কারণ বিশ্বাসের বশে একটা অন্যায় কিছু ঘটে যায় সেটা আমি চাই না।

কী অন্যায়?

আমার যা পাওনা তা থেকে বঞ্চিত করতে দেব না তোমাকে আমি।

কী বলছি তুমি!

ঠিকই বলছি। একবার উইল বদল করেছ, তুমি বীরু আসবে না ভেবে। তার পর আবার–

উইল আমি এমনিও চেঞ্জ করতাম।–মহেশবাবুর গলার স্বর চড়ে গেছে; তাঁর পুরনো রাগ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তিনি বলে চলেছেন–

তুমি আমার সম্পত্তির ভাগ পাবার আশা করা কী করে? তুমি অসৎ, তুমি জুয়াড়ি, তুমি চোর –লজ্জা করে না? আমার আলমারি থেকে দোরাবাজীর দেওয়া স্ট্যাম্প অ্যালবাম–

মহেশবাবুর বাকি কথা অরুণবাবুর কথায় ঢাকা পড়ে গেল। তিনি উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠেছেন–

আর তুমি? আমি যদি চোর হই। তবে তুমি কী? তুমি কি ভেবেছ আমি জানি না? দীনদয়ালের কী হয়েছিল। আমি জানি না? তোমার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সব দেখেছিলাম আমি পদার ফাঁক দিয়ে। পঁয়ত্রিশ বছর আমি মুখ বন্ধ রেখেছি। তুমি দীনদয়ালের মাথায় বাড়ি মেরেছিলে পিতলের বুদ্ধমূর্তি দিয়ে। দীনদয়াল মরে যায়। তারপর নূর মহম্মদ আর ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়িতে করে তার লাশ–

এর পরেই একটা ঝুপ শব্দ, আর কথা বন্ধ। তার পর শুধু পাখির ডাক আর জলের শব্দ।

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে সেটা প্রীতীনবাবুকে ফেরত দিয়ে দিল ফেলুদা।

মিনিটখানেক সকলেই চুপ, আর সকলেই কাঠ, এক ফেলুদা ছাড়া।

ফেলুদা রিভলবার চালান দিল পকেটে। তার পর বলল, আপনার বাবা গর্হিত কাজ করেছিলেন, সাংঘাতিক অন্যায় করেছিলেন, সেটা ঠিক, কিন্তু তার জন্য

তিনি পঁয়ত্রিশ বছর যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, যত রকমে পেরেছেন প্রায়শ্চিত্ত করেছেন; তবুও তিনি শান্তি পাননি। যেদিন সেই ঘটনা ঘটে, সেইদিন থেকেই তাঁর ধারণা হয়েছে যে, তাঁর জীবনটা অভিশপ্ত, তাঁর অন্যায়ের শাস্তি তাঁকে একদিন না এক' দিন পেতেই হবে। অবিশ্যি সেই শাস্তি এভাবে তাঁর নিজের ছেলের হাত থেকে আসবে, সেটা তিনি ভেবেছিলেন কি না জানি না। অরুণবাবু, পাথরের মতো বসে আছেন মেঝের বাঘছালটার দিকে একদৃষ্টি চেয়ে। যখন কথা বললেন, তখন মনে হল তাঁর গলার স্বরটা আসছে অনেক দূর থেকে।

একটা কুকুর ছিল; আইরিশ টেরিয়ার। বাবার খুব প্রিয়। দীনদয়ালকে দেখতে পারত। না কুকুরটা। এক' দিন কামড়াতে যায়। দীনদয়াল লাঠির বাড়ি মারে। কুকুরটা জখম হয়। বাবা ফেরেন রাত্তিরে- পার্টি থেকে। কুকুরটা ওঁর ঘরেই অপেক্ষা করত। সেদিন ছিল না। নূর মহম্মদ ঘটনাটা বলে। বাবা দীনদয়ালকে ডেকে পাঠান। রাগলে বাবা আর মানুষ থাকতেন না...

ফেলুদার সঙ্গে আমরাও উঠে পড়লাম। অখিলবাবুও উঠছেন দেখে ফেলুদা বলল, আপনি একটু আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন। কি? কাজ ছিল।

চলুন, বললেন ভদ্রলোক, মহেশ চলে গিয়ে আমার তো এখন অখণ্ড অবসর।

১২. গাড়িতে অখিলবাবু বললেন

গাড়িতে অখিলবাবু বললেন—আমার নাম লেখা পাথরটার পাশে দাঁড়িয়েই আমি ওদের কথা শুনতে পাই। তাকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করেছি। সে হঠাৎ হঠাৎ এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে কেন। সে ঠাট্টা করে বলত—তুমি গুনে বার করো, আমি বলব না। আশ্চর্য্য-তার জীবনের এত বড় একটা ঘটনা—সেটা কুষ্ঠিতে ধরা পড়ল না কেন বুঝতে পারছি না! হয়তো আমারই অক্ষমতা।

বাড়ির কাছাকাছি। যখন পৌঁছেছি তখন বুঝতে পারলাম ফেলুদা কাকে ফোন করেছিল।

ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন শঙ্করলাল মিশ্র।

আপনার মিশন সাকসেসফুল? গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

হ্যাঁ, বললেন শঙ্করলাল, বীরেন এসেছে।

আমরা বৈঠকখানায় ঢুকতে সেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলেন। লম্বা চুল, রুক্ষ লম্বা দাড়ি, লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা।

বাপের শেষ ইচ্ছার কথা শুনে বীরেন। আসতে রাজি হল, বললেন শঙ্করলাল, মহেশবাবুর উপর কোনও আক্রোশ নেই ওর।

যেমন আক্রোশ নেই, তেমনি আকর্ষণও নেই বললেন বীরেন-সন্ন্যাসী।শঙ্কর এবার অনেক চেষ্টা করেছিল আমাকে ফিরিয়ে আনতে; বলেছিল-ওদের দেখলে তোমার টানটা হয়তো ফিরে আসবে। ওর কথাতেই আমি রাজরাপ্পায় গিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু দূর থেকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম আমার আত্মীয়দের উপর আমার কোনও

টান নেই। বাবা। তবু আমাকে কিছুটা বুঝেছিলেন, তাই প্রথম প্রথম ওঁকে চিঠিও লিখেছি। কিন্তু তারপর...

কিন্তু সে চিঠি তো আপনি বিদেশ থেকে লেখেননি, বলল ফেলুদা, আমার বিশ্বাস আপনি দেশের বাইরে কোথাও যাননি কোনওদিন।

বীরেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ-হেসে ফেললেন। আমি হতভম্ব, কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

শঙ্কর আমাকে বলেছিল। আপনার বুদ্ধির কথা বললেন বীরেনবাবু, তাই আপনাকে একটু পরীক্ষা করছিলাম।

তা হলে আর কী। খুলে ফেলুন আপনার অতিরিক্ত সাজ পোশাক। হাজারিবাগের রাস্তার লোকের পক্ষে ওটা যথেষ্ট হলেও আমার পক্ষে নয়।

বীরেনবাবু হাসতে হাসতে তাঁর দাড়ি আর পরিচুলা খুলে ফেললেন। লালমোহনবাবু আমার পাশ থেকে চাপা গলায় কান. কান. কান বলে থেমে গেলেন। আমি জানি তিনি আবার ভুল নামটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এবার বললেও আর শুধরোতে পারতাম না, কারণ আমার মুখ দিয়েও কথা বেরোচ্ছে না। কথা বললেন অখিলবাবু, বীরেন বাইবে যায়নি মানে? ওর চিঠিগুলো তা হলে...?

বাইরে না গিয়েও বিদেশ থেকে চিঠি লেখা যায় অখিলবাবু, যদি আপনার ছেলের মতো একজন কেউ বন্ধু থাকে বিদেশে, সাহায্য করার জন্য।

আমার ছেলে!

ঠিকই বলেছেন মিস্টার মিত্তির, বললেন বীরেন। কারান্ডিকার, অধীর যখন ডুসেলডর্ফে, তখন ওকে চিঠি লিখে আমি বেশ কিছু ইউরোপীয় পোস্ট কার্ড আনিয়ে নিই। সেগুলোতে ঠিকানা আর যা কিছু লিখবার লিখে খামের মধ্যে ভরে

ওর কাছেই পাঠাতাম, আর ও টিকিট লাগিয়ে ডাকে ফেলে দিত। অবিশ্যি অধীর দেশে ফিরে আসার পর সে সুযোগটা বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এই লুকোচুরির প্রয়োজনটা হল কেন? জিজ্ঞেস করলেন অখিলবাবু!

কারণ আছে, বলল ফেলুদা। আমি বীরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করতে চাই আমার অনুমান ঠিক কিনা।

বলুন।

বীরেনবাবু কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর মতো হতে চেয়েছিলেন। সুরেশ বিশ্বাস ঘর ছেড়ে খালাসি হয়ে বিদেশে গিয়ে শেষে ব্রেজিলে যুদ্ধ করে নাম করেছিলেন সেটা আমার মনে ছিল। যেটা মনে ছিল না সেটা আমি কাল রাত্রে বাঙালির সার্কাস বলে একটা বই থেকে জেনেছি। সেটা হল এই যে সুরেশ বিশ্বাস ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি বাঘ সিংহ ট্রেন করে সাকর্গসের খেলা দেখিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে আশ্চর্য খেলা ছিল সিংহের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া।

এখানে লালমোহনবাবু কেন যেন ভীষণ ছটফট করে উঠলেন।

ও মশাই! ছ্যাঃ ছাঃ ছাঃ, এই সেদিন পড়লুম, তাও খেয়াল হল না, ছাঃ ছাঃ ছাঃ...

আপনি ছ্যাছ্যাটা পরে করবেন, আগে আমাকে বলতে দিন।

ফেলুদার ধমকে লালমোহনবাবু ঠাণ্ডা হলেন। ফেলুদা বলে চলল, বীরেনবাবুর অ্যাম্বিশন ছিল আসলে বাঘ সিংহ নিয়ে খেলা দেখানো। কিন্তু বাঙালি ভদ্রঘরের ছেলে আজকের দিনে ওদিকে যেতে চাইছে শুনলে কেউ কি সেটা ভাল চোখে

দেখত? মহেশবাবুই কি খুশি মনে মত দিতেন? তাই বীরেনবাবুকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তাই নয় কি?

সম্পূর্ণ ঠিক, বললেন বীরেনবাবু।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অ্যাদ্দিন পরে ছেলেকে রিং-মাস্টার হিসেবে দেখেও মহেশবাবু তাকে চিনতে পেরেছিলেন, যদিও অরুণবাবু সামনে থেকে দেখেও চিনতে পারেননি। সেটার কারণ এই যে বীরেনবাবুর নাকে প্ল্যাস্টিক সার্জারি করানো হয়েছিল, যে কারণে ছেলেবেলার ছবির সঙ্গেও নাকের মিল সামান্যই।

তাই বলুন। বলে উঠলেন অখিলবাবু, তাই ভাবছি সবাই বীরেন বীরেন করছে, অথচ আমি সঠিক চিনতে পারছি না কেন?

যাক গে, বলল ফেলুদা, এখন আসল কাজে আসি।

ফেলুদা পকেট থেকে মুক্তানন্দের ছবিটা বার করল। তারপর বীরেনবাবুর দিকে ফিরে বলল, আপনি বোধহয় জানেন না যে, আপনি আর ফিরবেন না ভেবে মহেশবাবু আপনাকে তাঁর উইল থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সেই উইল আর বদল করার উপায় ছিল না। অথচ আপনি একেবারে বঞ্চিত হন সেটাও উনি চাননি। তাই এই ছবিটা আপনাকে দিয়েছেন।

ফেলুদা ছবিটা উলটে পিছনটা খুলে ফেলল। ভিতর থেকে বেরোল একটা ভাঁজ করা সেলোফেনের খাম, তার মধ্যে ছোট্ট ছোট কতগুলো রঙিন কাগজের টুকরো।

তিনটি মহাদেশের নটি দুষ্প্রাপ্য ডাক টিকিট আছে। এখানে। অ্যালবাম চুরি যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান স্ট্যাম্প কাটি এইভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন। গিবনস ক্যাটালগের হিসেবে পঁচিশ বছর আগে এই ডাক টিকিটের

দাম ছিল দু হাজার পাউন্ড। আমার ধারণা আজকের দিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা।

বীরেন্দ্র কারান্ডিকার খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন সেটার দিকে। তারপর বললেন, সার্কাসের রিং-মাস্টারের হাতে এ জিনিস যে বড় বেমানান, মিঃ মিত্তির! আমি খুব অসহায় বোধ করছি। আমরা যাযাবর, ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়াই, আমাদের কাছে এ জিনিস...?

বুঝতে পারছি। বলল ফেলুদা, এক কাজ করুন। ওটা আমাকেই দিন। কলকাতার কিছু স্ট্যাম্প ব্যবসায়ীর সঙ্গে চেনা আছে আমার। এর জন্য যা মূল্য পাওয়া যায় সেটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আমার উপর বিশ্বাস আছে তো আপনার?

সম্পূর্ণ। কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে আমাকে দিতে হবে।

গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্ক্স, বললেন বীরেনবাবু, কুট্টি বুঝেছে যে আমাকে ছাড়া তার চলবে না। আমি এখনও কিছুদিন আছি। এই সার্কাসের সঙ্গে। আজ রাত্রে সুলতানকে নিয়ে খেলা দেখাব; আসবেন।

রাত্রে গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কসে সুলতানের সঙ্গে কারান্ডিকারের আশ্চর্য খেলা দেখে বেরোবার আগে আমরা বীরেনবাবুকে থ্যাঙ্ক ইউ আর গুড বাই জানাতে তাঁর তাঁবুতে গেলাম। আইডিয়াটা লালমোহনবাবুর, আর কারণটা বুঝতে পারলাম তাঁর কথায়।

আপনার নামটার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য কাণ্ডকারখানা রয়েছে, বললেন জটায়ু, ডু ইউ মাইন্ড যদি আমি নামটা আমার সামনের উপন্যাসে ব্যবহার করি? সার্কাস নিয়েই গল্প, রিং-মাস্টার একটা প্রধান চরিত্র।

বীরেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, নামটা তো আমার নিজের নয়! আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পর ফেলুদা বলল, তা হলে ইনজেকশন বাদ?

বাদ কেন মশাই? ইনজেকশন দিচ্ছে বাঘকে। ভিলেন হচ্ছে সেকেন্ড ট্রেনার। বাঘকে নিস্তেজ করে কারান্ডিকারকে ডাউন করবে দর্শকদের সামনে।

আর ট্র্যাপিজ?

ট্র্যাপিজ ইজ নাথিং, অবজ্ঞা আর বিরক্তি মেশানো সুরে বললেন লালমোহন গাঙ্গুলী।